রম্য-রচনা, গল্প, কবিতা ও অন্যান্য

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

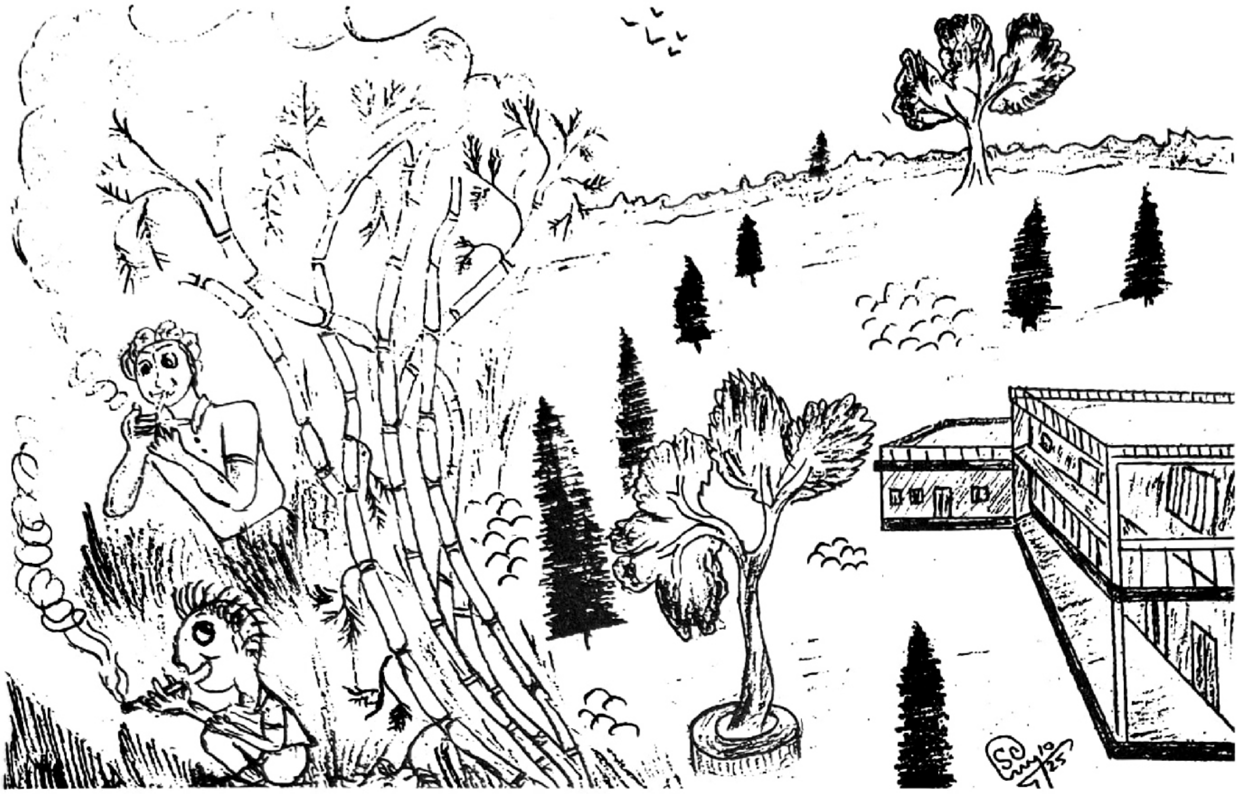
রম্য-রচনা, গল্প, কবিতা ও অন্যান্য

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

রম্য-রচনা, গল্প, কবিতা ও অন্যান্য

রম্য রচনা		
বিড়িখেকো বংশীধর	অন্বেষা	২০২৬
চার বিশেষজ্ঞের সভা	অন্বেষা	২০২১
কি বিপদ!	অন্বেষা	২০১৭
গো-সম্পর্কিত গল্প	অন্বেষা	২০১৭
টাক-কথা	অন্বেষা	২০১৬
জীবনের হিসাব	অন্বেষা	২০১৬
বিয়ে-কম	অন্বেষা	২০১৫
আম্রকথা	অন্বেষা	২০১৫
কো-আক	অন্বেষা	২০১৪
গল্পের গোরুর আসল উৎস	অন্বেষা	২০১৪
ইজ ইট এ জোক?	অন্বেষা	২০১৩
মহিষ কখন সিংহ খায়	অন্বেষা	২০১৩
তেল	জলসিঁড়ি	২০০৬
গল্প		
একটি নীরস ঘটনা	অন্বেষা	২০২০
সংকেত	স্মরণিকা	২০১০
পাড়ি	ঝড়, পূজাবার্ষিকী	২০০৬
মেঘ-বৃষ্টি-রোদ্দুর	ঝড়, পূজাবার্ষিকী	২০০৫
উত্তরণ	কবিতার কাগজ, পূজাবার্ষিকী	২০০৩
কবিতা		
গণ-তান্ত্রিক	অমৃত কুম্ভ	২০০৯
দুটি রাজনৈতিক কবিতা	বাসন্তিক	২০০৯
আ মরি!	স্মরণিকা	২০০৮
দুটি কবিতা	তমলুক-স্মরণিকা	২০০৩
অন্যান্য লেখা		
রমাপতি স্যার—নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান	স্বপ্নস্রষ্টা	২০২৪
আসুন, আত্মহত্যা করা থেকে আত্মরক্ষা করি	ঝড়, সাপ্তাহিক	২০২৫
বাংলার সাপ	বসন্ত সখা	২০১৩
দেখা	কালের চেতনা	২০০৬
গল্প নিয়ে গল্প	স্পন্দন	১৯৮৮
রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিকতা	স্পন্দন	১৯৮৭

রম্য-রচনা



বিড়িখেকো বংশীধর

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক (কোলকাতা জেলা)

বংশী!

বংশীধর দাস।

অষ্টম শ্রেণি, অর্থাৎ এখনকার ক্লাস এইটে প্রথম আমি বংশীকে দেখি। তখন আমরা ক্লাস সেভেন থেকে পাশ করে সবে ক'দিন এইটের ক্লাস করছি। সেই যুগের নিয়ম অনুযায়ী কয়েকজন বয়স্ক 'ফেলু' দাদারা কেউ এক বছর, কেউ বা দু-তিন বছর ধরে ফেল করে করে ক্লাস এইটে আগে থেকেই পড়ছিল। ওনাদের অনেকের ভালোমত গোঁফ-দাড়িও বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন আমাদের স্কুলে ভর্তি হল, তখন কাশীকে আমাদের ফেলুদাদাদের থেকেও বয়স্ক লাগছিল।

নতুন ছাত্র হিসাবে বংশী প্রথমদিন ক্লাসে এসেছে। যথারীতি, আমাদের খগেন স্যার (খগেন্দ্রনাথ মাল, ক্লাস এইটের বিজ্ঞান শিক্ষক) ওনার সরু নাকের উপর নেমে আসা চশমাটা কিছুটা উপরের দিকে ঠেলে হাতের লম্বা বেতটা সপাং করে সামনের টেবিলের ওপর মেরে জিগ্গেস করলেন— অ্যাই, তোর নাম কি র‍্যা?

বেত নাচানোটা ছিল খগেন স্যারের মুদ্রাদোষ।

স্যারের বেতের ঘা খেতো স্যারের টেবিল, কখনও সখনও আমাদের হাই বেঞ্চের টেবিল বা আমাদের বই-খাতা। কারোর হাতে বা পিঠে কোনদিন পড়েছে বলে শুনিনি।

তার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। ওনার খেঁক্‌রে চেহারা, গোটানো হাতা থেকে বেরিয়ে আসা শিরাবহুল সরু সরু হাত, ঢোলা ধুতি-পাঞ্জাবি আর তার সঙ্গে বাজখাঁই গলার ধমক এবং বেতের আস্ফালন—এতেই অনেক ছেলের প্যান্টে 'ইয়ে' হয়ে যেত।

তা খগেন স্যার যেই নাম জিগ্‌গেস করলেন, অমনি ভয় পেয়েই বোধহয় বংশী বলতে লাগল—আমার নাম শ্রী বংশীধর দাস স্যার।

পিতা স্বর্গীয় ধরণীধর দাস স্যার,

গ্রাম হলধরপুর, পোষ্ট অফিস খ্যাংরাডাঙ্গা, জেলা মেদিনীপুর, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ স্যার।

খগেন স্যার গর্জন করে বললেন— আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? বলেই বেতের এক ঘা বসালেন বংশীর টেবিলে।

পরে, বংশীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল। বার বার ফেল করার জন্য ওর গ্রামের স্কুল ওকে টি. সি. (Transfer Certificate) দিয়ে দিয়েছে। আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন বংশীর পিসতুতো দিদির মামাতো ভাই— বা এরকম কিছু। সেই সূত্রে বংশী আমাদের স্কুলে ভর্তি হয়েছিল।

আস্তে আস্তে বংশীর অনেক গুণ প্রকাশ পেতে লাগল। এমনিতে বংশী সিধে-সাধা ধরনের, একটু বোকা-সোকা, কিন্তু কেউ কোন কথা বললেই কিছু বুঝুক না বুঝুক, চটপট উত্তর দিতে চায়।

এই খগেন স্যারই একদিন বিজ্ঞানের ক্লাসে খাদ্য আর খাদক নিয়ে পড়াচ্ছিলেন, যে খায়— সে হল খাদক আর যাকে খায়, সে হল খাদ্য। স্যার ভাত আর মানুষ, ঘাস আর হাতি, হরিণ আর বাঘ— এরকম কিছু উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছিলেন। বংশী খুব মন দিয়ে স্যারের কথা শুনছিল। এই ক্লাসের পরই ছিল টিফিন পিরিয়ড। টিফিন পিরিয়ডে কেউ বাড়ি থেকে আসা টিফিন আর কেউ দশ পয়সার বাদাম-চাক খেয়ে আড্ডা দিতে দিতে ঘুরে বেড়াতাম স্কুলের মাঠে, আশে পাশে বা স্কুলের গেট পেরিয়ে কাঁসাই নদীর ধারের বাঁশ জঙ্গলের সামনে নদীর চড়ায়।

বংশী প্রতিদিন বাঁশ বাগানের পাশে, নদীর ধারে যেত। শুধু টিফিন পিরিয়ডে নয়— বড় বাইরে পেয়েছে বলেও মাঝেমধ্যে ক্লাসের থেকে বেরিয়ে ওখানে যেত। আমরা সবাই আসল কারণটা জানতাম, তবে ক্লাসের 'ফেলু' দাদাদের ভয়ে কোনদিন স্যারকে বলিনি। বংশী বিড়ি খেতে যেতো। ওর সঙ্গে সবসময় অন্ততঃ এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা দেশলাই থাকত। সেই বিড়ি নিজে খেতো আর ফেলু দাদাদের ভাগও দিত। তবে ফেলু দাদারা কেউ সঙ্গে বিড়ি রাখতো না।

সেদিন ক্লাস শেষ হওয়ার পর বাঁশবনের ধারে দাঁড়িয়ে বংশী বিড়ি খাচ্ছিল আর একজন ফেলুদাদার সঙ্গে তর্ক জুড়েছিল। দুধ যে খায়, সে দুধ খাদক, মাছ যে খায়, সে মাছ খাদক, যে চা খায় সে চা খাদক হবে কি হবে না—এই ছিল বিতর্কের বিষয়। হঠাৎ করে সেই ফেলু দাদাটি বলে বসল— তুই যে এত বিড়ি খাস— তুই কি তাহলে বিড়ি খাদক?

কথাটা আমাদের কানে এল।

ব্যস! এই কথা ঘুরে ফিরে, শেষ-মেস ফিরে গেল বংশীর দিকেই।

বংশীর স্থায়ী নামকরণ হয়ে গেল বিড়িখেকো বংশীধর।

বিড়িখেকো বংশীধরের পরবর্তী আরো কিছু ঘটনা পরের সুযোগে জানাবো।

চার বিশেষজ্ঞের সভা

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

বিশেষজ্ঞদের সভা কেমন হয় জানেন তো?

একটি আলোচনায় বিষয় প্রথমে ঠিক করা হয়। সেই বিষয় নিয়ে এরপর বিশেষজ্ঞরা যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করতে বসেন। শেষে সেই বিষয়টিতে বিশেষজ্ঞরা কম বেশি একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে এগিয়ে যান।

আমরা চার বন্ধু এরকম একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরী করেছিলাম। মাঝে মধ্যেই সেই সভা বসত আমাদের হাইস্কুলের পেছনে কাঁসাই নদীর তীরে সিমেন্ট বাঁধানো বসবার বেঞ্চটিতে। তখন আমরা সবে ছোট ইস্কুল (প্রাইমারী) ছেড়ে বড় ইস্কুলে (সেকেন্ডারী) ভর্তি হয়েছি, সেজন্য প্রাইমারীর ছোট ছেলেমেয়েদের একটু করুণার চোখেও দেখতাম। সালটা ছিল ১৯৭৭-৭৮। সভা সাধারণতঃ বসতো টিফিন পিরিয়ডে। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ নানান বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতাম। সেই রকম কয়েকটি আলোচনার কথা আজ আপনাদের শেনাবো।

আমরা সবাইতো এখন বড় (বুড়ো?) হয়ে গেছি, তবু সাবধানতার খাতিরে নিজেদের নামের প্রথম অক্ষরটুকু কেবল ব্যবহার করব। এর প্রধান কারণ—এই চারজনের একজন এখন হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার। পুলিশ আর উকিলদের আমি ছেলেবেলা থেকে ভীষণ ভয় পাই।

সভার বিষয় ঃ সাত-মণি হার

সেযুগে, আমাদের ছেলেবেলায় সেই অজ গ্রামেও মাঝে মধ্যে মাইকে গান শোনা যেত। দুরের কোন অনুষ্ঠান বাড়ীতে বাজানো মাইকের গান প্রায়ই শুনতে পেতাম। একদিন শুনতে পেলাম গান বাজাচ্ছে দূরে কোথাও—সাত-মণি হার দেবো....। (আসলে এটা ছিল দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া— সাতনরী হার দেবো। অনেক দূরে বাজানো গান—তাই শুনতে সামান্য ভুল হয়েছিল)। এই গান নিয়ে শুরু হল আমাদের আলোচনা।

মঃ অ্যাই শুনছিস, গানটাতে কি বলছে?

শিঃ হুঁ, সাতমণি হার দেবো-টেবো বলছে।

অঃ অ্যাঁ? তার মানে কি?

মঃ মানে আবার কি? হার দেবে।

শিঃ হ্যাঁরে, সোনার হার তো মেয়েরা গলায় পরে।

প্রঃ ঠিক বলেছিস। আমার দিদির জন্য বাবা একটা কিনে রেখেছে। বলছে বিয়ের সময় লাগবে।

শিঃ হ্যাঁরে, সাতমণি হার মানে কিরকম হার?

অঃ এটাতো বোঝাই যাচ্ছে।

মঃ কি?

অঃ আরে সাতমণ ওজনের হার দেবে আর কি।

শিঃ তা ঠিক। কিন্তু একমণ মানে তো চল্লিশ সের হয় বলে শুনেছি।

মঃ তাতে কি? ওসব বড়লোকের মেয়েরা পরে। তুই বুঝবি না।

অঃ তা ঠিক বলেছিস।

(সাত মণ = ২৪০ কিলোগ্রাম)

সভার বিষয় ঃ শেরশাহ আর ঘোড়া

সেদিন ইতিহাসের ক্লাসে শের শাহকে নিয়ে পড়ানো হচ্ছিল। সেই নিয়ে আলোচনা শুরু হল—উনি বিরাট একটা রাস্তা তৈরী করেছিলেন (গ্র্যান্ট ট্যাঙ্ক রোড), হুমায়ুন বাদশাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন—এসব নিয়ে অনেক আলোচনা চলছিল।

প্রঃ অ্যাই, শেরশাহ ঘোড়ার ডাক শুরু করেছিলেন, শুনলি তো?

শিঃ হ্যাঁ, খগেনবাবু পড়ালেন তো।

অঃ বীর মানুষ! বীরেরা কত কি করতে পারে।

বঃ ভাবতে পারছিস? ঘোড়াগুলো ডাকতে জানত না। শেরশাহ ওগুলোকে ডাকতে শেখালেন!

শিঃ ভাব একবার! বীররা এরকমই হয়।

সভার বিষয় ঃ বাটার উৎপাদন কারখানা

সে যুগে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে আমূল কোম্পানীর বাটার বা মার্জারিন নামের কৃত্তিম বাটার—কিছুই পাওয়া যেত না। নামও কেউ বোধহয় শোনেনি। দুধ থেকে যে মাখন তৈরী হতো তাকে ইংরেজীতে বাটার বলে—একথা জেনেছিলাম সেদিন। সেজন্য সেদিনের আলোচনার গতিমুখও তাই ছিল বাটার কেন্দ্রিক।

শিঃ অ্যাই, তোরা কেউ বাটার খেয়েছিস।

অঃ আরে মাঝে মাঝে বাড়ীতে ঠাকুমা যে মাখন বানায়, তাকেই তো বলে বাটার।

প্রঃ জানি, জানি। অ্যাই ম....., তুই তখন থেকে তেঁতুল গাছের ডালের দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? কি দেখছিস?

মঃ ভাবছি, একটা দারুন কথা মাথায় এসেছে রে, মাইরি। তেতুল গাছের উপরের ডালে ঐ মৌচাকটা দেখেছিস?

শিঃ হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?

মঃ হ্যারে, দেখ, মৌমাছি মৌচাক তৈরী করে মধু জমিয়ে রাখে। ময়ুল (মধু সংগ্রহ করে যারা) এসে কেমন মধু বের করে আনে।

প্রঃ তো?

মঃ মৌমাছি যদি মধু তৈরী করতে পারে, তাহলে সহজেইতো বাটার তৈরী করা যায়।

শিঃ কিভাবে?

মঃ কেন? বাটার ফ্লাই চাষ করলে, তারা ওরকম করে বাটার জমা করবে বাসায়, আর ময়ুল এসে সেটাকে পেড়ে আনবে! মধুর মতোই বাটার ফ্লাইয়ে চাক থেকে পেয়ে যাবো বাটার!

শিঃ তুই সেই বাটার ফ্লাই পাবি কোথায়?

মঃ কেন? আরে এই প্রজাপতিগুলোকেই তো বাটার ফ্লাই বলে। ওগুলোকে চাষ করলেই তো হবে। আমরা সবাই এই সিদ্ধান্তে একমত। বড় হলে একদিন এই ব্যবসাটি আমরা চালু করবই, এমন প্রতিজ্ঞা আমরা সেদিন করেছিলাম।

কি বিপদ!

ডা: শিবব্রত পট্টনায়েক

কোলকাতার এক ছুটির দিনের বাস। দুপুরবেলা। বাসে কয়েকজন মাত্র যাত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। বাকীরা বসে। বাসের দরজার কাছে দাঁড়ানো একজন যাত্রী পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন—

'ক... ক.... টা বে... বেজেছে দা..দাদা?'

অন্য যাত্রী কোনো উত্তর দিলেন না।

'দা... দ্দা, ক... ক্কটা বে.. বেজ্জেছে বো... ও... ওলবেন?'

কোনো উত্তর নেই।

যাত্রীটি তখন দ্বিতীয় যাত্রীর বাহুতে একটু ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

'ও... ও দাদ্দা, ক:.. ক্ক টা বে... বেব...জেছে ব্ব... লতে প্পা... পা রেচ্ছেন ন...না?'

যথারীতি এরপরও দ্বিতীয় যাত্রী ভদ্রলোক নিরুত্তর। রেগে গজগজ করতে করতে যাত্রীটি একটু পরেই বাস থেকে নেমে গেলেন।

প্রথম যাত্রীটি বাস থেকে নেমে যাওয়ার পর দ্বিতীয় যাত্রী ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়ানো সহযাত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, আপনাকে উনি এতোবার ক'টা বেজেছে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোনো উত্তর দিলেন না কেন? উনি রেগেমেগে নেমে গেলেন। ক'টা বেজেছে বলে দিলে কি এমন ক্ষতি হত আপনার?'

একথা শুনে বোধহয় আর থাকতে পারলেন না ভদ্রলোক। রেগে উত্তর দিলেন—

'মু...ম্মুখ খু... খুলি আ... আর মা... মার খাই আ... আর কি?'

রম্যরচনা

গো-সম্পর্কিত গল্প

ডা: শিবব্রত পট্টনায়েক

আমাদের সঙ্গে ক্লাস ফাইভে পড়ত হাবু। হাবু এমনিতে ছিল খুব স্মার্ট, সমস্ত বিষয়েই তার এমন জ্ঞান ছিল যে সবার আগে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মন্তব্য করত। কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারে সে ছিল ভীষণ অলস, সবসময় স্টেজে মেরে দেওয়ার ব্যাপারে ছিল দারুণ আত্মবিশ্বাসী।

সেবার স্কুলের অ্যানুয়েলের বাংলা পরীক্ষার আগে বন্ধুরা সাজেশান করে সতেরোটা বাংলা রচনা মুখস্ত করেছি। হাবুকে জিজ্ঞাসা করতে বলল যে একটা রচনাই সে ঠিক করে মনে রেখেছে। বাকিটা পরীক্ষার হলে ম্যানেজ করে দেবে।

সেবার পরীক্ষায় এল 'নদী' রচনা। পরীক্ষার পর খেলার মাঠে হাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিরে, রচনা কি লিখলি?'

— কেন, নদী রচনা লিখলাম।

— কি করে? তুই তো নদী রচনা মুখস্ত করে যাসনি?

— ও! সে ঠিক ম্যানেজ করে নিয়েছি।

হাবুর দাদা বকু ছিল হাবুর চেয়ে তিন বছরে বড়। কিন্তু পর পর দুবার ফেল করে তখন ক্লাস সিক্সে পড়ে। বকু ভাইকে জিজ্ঞাসা করল—

— হ্যাঁরে, তুই কিভাবে ম্যানেজ করলি?

— কেন? লিখলাম— আমাদের গ্রামের পাশে বয়ে চলেছে একটি নদী। সেই নদীর দুই তীরে জন্মায় প্রচুর ঘাস, সেই ঘাস খেতে সেখানে তাই প্রচুর গোরু চরে বেড়ায়। গোরুর চারটি পা, একটি লেজ, মাথায় দুটো কান আর দুটো সিং আছে। গোরু লেজ দিয়ে মাছি তাড়ায়। গোরুর চামড়া ছাড়িয়ে আমাদের জুতো তৈরি হয়— এইসব। গোরুর রচনা তো আমার মুখস্থ ছিলই।

আমরা অবাক হয়ে হাবুর বুদ্ধি কথা আলোচনা করতে লাগলাম। তারপর সেদিন যে যার বাড়ী চলে গেলাম।

পরদিন ছিল রবিবার। তারপর সোমবার আবার খেলার মাঠে হাবুর সঙ্গে দেখা হল। হাবুর সঙ্গে ওর দাদা বকু।

বকুদা কথায় কথায় বলল— আজ আমার বাংলা পরীক্ষা ছিল। সেদিন হাবুর রচনা লেখার কথা শুনে আজ আমিও ঠিক ম্যানেজর করে নিয়েছি।

সমীরণ জিজ্ঞাসা করল— বকুদা, তোমার কি রচনা পরীক্ষাতে পড়েছিল?

— তোমার বাবা।

— তুমি কিভাবে ম্যানেজ করলে?

— কেন? আমিও হাবুর মতো ওর গোরুর রচনাটাই গতকাল সারাদিন ধরে মুখস্ত করেছিলাম। সেটাই লিখে দিয়ে এলাম।

— কি লিখলে?

— আমি লিখলাম, আমার একটা বাবা আছে। বাবার চারটে পা, একটি লেজ, মাথায় দুটো কান আর দুটো সিং আছে। বাবা লেজ দিয়ে মাছি তাড়ায়। বাবার চামড়া ছাড়িয়ে আমাদের জুতো তৈরি হয়— এইসব। একদম ঝাড়া মুখস্ত ছিল। ঝেড়ে লিখে দিয়ে এসেছি। এবারে আমার পাশ করা আটকায় কে?

রম্যরচনা

টাক-কথা

ডা: শিবব্রত পট্টনায়েক

গুরুদেব মার্কণ্ড একমাত্র শিষ্য পুণ্ডরীকাক্ষকে লইয়া কাশীধাম যাইবার পথে শিষ্যের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সেই কথোপকথনের একাংশ এখানে পরিবেশিত হইল।

শিষ্য— গুরুদেব, টাক কয় প্রকার ও কি কি?

গুরুদেব— হে পুণ্ডরীকাক্ষে! ভারতবর্ষীয় টাক চার প্রকার। ইহাদিগের মধ্যে সর্বাধিক দৃষ্ট হইল দুখটাক, অর্থাৎ দুখী ব্যক্তিগণের মধ্যে দৃষ্ট টাক। ইহা মুখমণ্ডলের সম্মুখদিক হইতে শুরু হইয়া ধীরে ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে পশচাতদিকে প্রসারিত হইতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার টাক হইল সুখ-টাক। ইহা সাধারণত সুখী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আকৃতি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোলাকার। কিন্তু আয়তন বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। চারিদিকে উদ্ভিদবেষ্টিত সরোবরের ন্যায় ইহা দীপ্যমান হয়। কোনো কারণে কেশ রঞ্জিত করিলে এই টাকাংশও কিঞ্চিত রঞ্জিত হইয়া থাকে। তৎকালে ইহার উজ্জ্বলতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকার টাক হইল টুক-টাক। অর্থাৎ মস্তকের বিভিন্ন স্থানে এক বা বহু ক্ষুদ্র হইতে মাঝারি আকৃতির টাক। সুখ-টাককে গগনের চন্দ্রের সহিত তুলনা করিলে ইহাদিগকে তারকাগণের সহিত তুলনা করিতে হয়। মহিলাদিগের মধ্যেও এই প্রকার টাক বর্তমান, কিন্তু কদাচিত দৃষ্ট। কারণ বৃহতাকৃতির কেশসমূহ ইহাকে আবৃত করিয়া রাখে।

চতুর্থ প্রকার টাকের নামকরণ করা যায় 'স্মৃতিটুকু থাক' রূপে। ইহা মধ্য ও উচ্চবিত্ত বঙ্গবাসীগণের মধ্যেই সাধারণত দৃষ্টমান হয়। পূর্ণ মস্তকের মধ্যে কেবলমাত্র অন্তিম ডান অথবা বাম প্রান্তে চারি হইতে চোদ্দটি কেশ বর্তমান থাকে, বাকী অংশ থাকে পূর্ণিমার উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কেশহীন। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিগণ ঐ কয়টি কেশকে বহু যত্নপূর্বক বারংবার মস্তকের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া থাকে। প্রত্যহ সপ্তম হইতে একাদশ বার আর্শির সম্মুখে এবং সপ্তদশ হইতে একদ্বিংশবার আর্শি ব্যতিরেকে উহাদিগের এইরূপ পরিচর্যা করা হয়। সম্ভবতঃ উক্ত ব্যক্তিগণের অতীত দিনের মস্তকভরা কেশের স্মৃতিতে এইপ্রকার কেশ-পরিচর্যা করা হয়, সেজন্য এইপ্রকার টাকের নামকরণ সার্থক।

রম্যরচনা

জীবনের হিসাব

ডা: শিবব্রত পট্টনায়েক

এ হল সেই আদ্যিকালের কথা। প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন পৃথিবীতে জীব সৃষ্টি করার কাজে ব্যস্ত। পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীর জন্য সমস্ত জীব-আত্মা সৃষ্টি করা হয়ে গেছে। হেডক্লার্ক চিত্রগুপ্ত ক'দিনের জন্য ক্যাম্প করে কাউন্টার খুলে বসেছেন। এবার জীব-আত্মাদের পরমায়ু দান করা হবে। বিভিন্ন জীবনকালের জন্য আলাদা আলাদা করে বিভিন্ন মেয়াদের স্লিপ তিরণ করা হয়ে গেছে। এবার বিভিন্ন কাউন্টারে গিয়ে চিত্রগুপ্তের চেলাদের কাছে স্লিপ জমা করে পরমায়ু নথিভুক্ত করতে হবে। যদিও প্রজাপতি ব্রহ্মা বলেছেন যে, এই পরমায়ু যে কোনো প্রজাতির জীবের জন্য মোটামুটি উচ্চতম সীমানির্দেশ করবে, তবে সেই প্রজাতির সবাই ততদিন বাঁচবে না। তবু জীব-আত্মাদের মধ্যে দারুন উত্তেজনা। এদিকে সারারাত ধরে আসব পান করে চিত্রগুপ্তের চেলাদের অনেক দেরি করে ঘুম ভেঙ্গেছে। হুড়মুড়িয়ে কাঁচা ঘুম ভেঙে এসে কাউন্টার খুলে বসতে হয়েছে।

মানুষের সঙ্গে একই কাউন্টারে লাইন দিয়েছে ২০-১০০ বছরের পরমায়ুর স্লিপ পাওয়া অর্থাৎ ২টি থেকে ১০টি ১০ বছর মেয়াদের স্লিপ পাওয়া বিভিন্ন প্রজাতির জীব-আত্মা। তবে মানব জীব-আত্মা কূটবুদ্ধিতে সেদিনও ছিল অন্য সব প্রজাতির উপরে। কিন্তু তার হাতে আছে মাত্র ৪টি স্লিপ— অর্থাৎ ৪০ বছরের পরমায়ু। ধূর্ত মানব-আত্মা আরও কিছু পরমায়ু হাতানোর চেষ্টায় সামনে দেখতে পেল গাধা-আত্মাকে। তারও পরমায়ু ৪০ বছর পর্যন্ত।

মানুষ— এই গাধা, তোর 'ডিউটি চার্ট' দেখেছিস? সারাজীবন শুধু আধপেটা খেয়ে অন্যের বোঝা বয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া! কাজের একটু এদিক-ওদিক হলেই পাবি নির্যাতন। এরকম করে তুই চল্লিশ বছর বাঁচবি? চ-ল্লি-শ বছর!

গাধা— তুমি তো ঠিকই বলছ গো! তাহলে কি করা যায়?

মানুষ— শোন। তুই তোর ঐ দশ বছরের দুটো স্লিপ আমাকে দিয়ে দে। তাহলে আর বুড়ো বয়স অবধি আমার বোঝা তোকে বইতেও হবে না, নির্যাতনও সহ্য করতে হবে না।

বোকা গাধা মানব-আত্মাকে তার দুটো স্লিপ দিয়ে দিল।

মানব-আত্মা খুব খুশি। ফোকটে ৬০ বছর অবধি বেঁচে থাকার স্লিপ পাওয়া গেল। কিন্তু মানব চরিত্র চিরকালই একইরকম, ধান্ধাবাজিতে সাফল্য এলে লোভ বাড়তেই থাকে। একটু পরেই তার নজরে পড়ল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুর-আত্মার উপর। সেও দাঁড়িয়ে আছে হাতে চল্লিশ বছর অবধি পরমায়ুর স্লিপ নিয়ে।

যথারীতি তাকেও মানুষ ভুজুং-ভাজুং দিয়ে তার 'ডিউটি চার্ট'-এর ভয় দেখিয়ে আরও ২০ বছরের আয়ু জোগাড় করে নিল।

এরপর মানব-আত্মার নজরে পড়ল পাশের লাইনের দিকে। সেখানে একদম কাছে দাঁড়িয়ে ছিল শকুনের আত্মা। তারও চল্লিশ বছরের আয়ু। ভুজুং-ভাজুং দিয়ে যথারীতি তার কাছ থেকেও মানব-আত্মা জোগাড় করে নিল আরও ২০ বছরের আয়ু।

ইতিমধ্যে লাইন এগিয়ে গেছে অনেকটাই। কাউন্টারের সামনে পৌঁছে মানব-আত্মা চট্‌পট্‌ জমা করল ১০ বছরের ১০টি স্লিপ। লাল চোখে বেশি কিছু দেখা-বোঝার অবস্থায় ছিল না কাউন্টারে থাকা চিত্রগুপ্তের চেলার। কোনোকিছু না দেখেই মানুষের নামে ১০০ বছর অবধি পরমায়ু জমা করে দিল। মানব-আত্মার খুশি আর ধরে না!

এরপর পৃথিবীতে সব জীব জন্মাল। মানুষও জন্মাল। সেই আদিম মানুষের বংশধর আমরা। আদিম মানব-আত্মার জোটানো আয়ু আমরাও ভোগ করি। কিন্তু সেই আদিম মানব-আত্মার জানা ছিল না যে, প্রতিটি জীবের আয়ুর সঙ্গে জীবের জীবনযাপনও যুক্ত করা ছিল। তাই আজও আমাদের চল্লিশ বছর বয়স অবধি— 'মানুষের জীবন', চল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়স অবধি 'গাধার জীবন', ষাট থেকে আশি বছর অবধি 'কুকুরের জীবন', আশি বছরের পরের থেকে শুরু হয় 'শকুনের জীবন।'

একটু হাসো

বিয়ে কম

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

বিনোদ বিহারী মোদক নামের এক সুদখোর রেশন দেকানদার সুদের টাকা আর রেশনের চাল-গম বেচার টাকা জমিয়ে বেশ ধনী হয়ে উঠেছিল। এরপর মোটা বরপনের লোভ দেখিয়ে তিনটি মেয়েকে তিন স্কুল শিক্ষকের সাথে বিয়ে দিয়েছিল। ছোট মেয়ের বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান চুকে যাবার পর একদিন সন্ধ্যেবেলা নিজের দোকান ঘরের বাইরে খাটিয়ায় বসে বিড়ি খেতে খেতে সামনের খাটিয়া আর বেঞ্চিতে বসা অনুগ্রহ প্রার্থী কিছু খাতকের কাছে বক্তৃতা মারছিল। কথোপকথন ছিল এরকম ঃ-

প্রথম খাতক—বিনু কাকা, আপনার মেয়েগুলি কিন্তু খুব ভালো ঘরে পড়েছে। ভগবানের আশির্বাদে......

বিনোদ—কই আর ভালো বিয়ে হল রে!

দ্বিতীয় ঘাতক—কেন কাকা, বেশ তো তিনটে মাস্টার জমাই পেলে। বলতে নেই, জামাইগুলো সবাইতো দেখতে শুনতে ভালো। তাহলে?

বিনোদ—আরে মনোমত জামাই কই আর হল। বড় মেয়েটার ভালোই বিয়ে হয়েছিল। মেজোটারও যাই হোক খারাপ বিয়ে হয়নি। কিন্তু এই ছোট জামাইটার পড়াশোনা অনেক কম!

প্রথম খাতক—কেন? আপনার ছোট জামইওতো মাস্টারী করে, তাহলে.....

বিনোদ—তাতে কি? এই জামাইটার পড়াশোনা অনেক কম। সেজন্য আমর তেমন ইচ্ছে ছিল না। সবাই বলল, তাই....

চারজন খাতক একসঙ্গে—কি রকম?

বিনোদ—দ্যাখ, আমার বড়োজামাই বিয়ে বেশি পাস। মানে বিয়ের চেয়ে বেশি। মেজো জামাই বিয়ে পাশ। কিন্তু ছোট জামাইটা ঠিক বিয়ে পাশও নয় তো......

চতুর্থ ঘাতক—কেন কাকা? গ্রাজুয়েট না হলে মাস্টারী চাকুরী পেল কি করে?

বিনোদ—সে সব জানি না। তবে ছোট জামাই ভালো শিক্ষিত নয়, কেবল বিয়ে কম পাশ করেছে। মেজো জামাইয়ের থেকেও অনেক নিচে। বুঝলি না?

আপনারা কিছু বুঝলেন?

আম্রকথা

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

সেদিন তপনদার পাল্লায় পড়ে আমাদের অফিসের পাশের গাছ থেকে পাড়া কয়েকটা আম বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম। আমগুলি বেশ বড় বড় সাইজের, এক-একটার ৩০০—৪০০ গ্রাম ওজন হবে। বেশ বয়স্ক আম, দু-একদিন বাড়ীতে রাখলেই পেকে যাবে মনে হল। এরপর কদিন কাজের চাপে আমের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। গতকাল ছিল রবিবার। শনিবার বিকেলে আমার সেজোমামা দেশের বাড়ী থেকে এসেছেন। সেজোমামা ভীষণ রসিক, খাদ্যরসিকও। সকালে খবরের কাগজ পড়ছিলাম, হঠাৎ হইচই শুনে দেখি আমার ছেলে শ্রীমান কৌস্তভ আঁ আঁ করছে, তারপর বার বার থু থু করছে আর বার বার বেসিনে কুলকুচো করে মুখ ধুচ্ছে। কি ব্যাপার? অনেক প্রশ্নের পরে বুঝলাম আমার ছেলে অফিসের পাশের আমগাছের সেই আম রেখেছিল চালের ডাব্বাতে। বেশ টুস টুসে হয়ে পেকে গেছে দেখে আজ সকালে একটা আম খেতে গিয়েছিল। ছেলে আমার একটু পেটুক টাইপের। তো, সেই আম একটুখানি গিলে ফেলতে গিয়েই এই বিপত্তি। এসব আলোচনা চলছে—এমন সময় দেখি আমার সেজোমামা সেই কাটা আম শুঁকে আর একটু জিবে ঠেকিয়ে বলল ''এতোদিনে খোঁজ পেলাম। এই আম আমার ঠাকুদ্দা ছেলেবেলায় একবার নিয়ে এসেছিলেন, আর আজ আবার দেখলাম। এর দেখা পাওয়াই ভার। তোরা কেউ এই আমের নাম জানিস?"

ইতিমধ্যে আমি ভয়ে ভয়ে একটু আম জিবে ঠেকাতেই মনে হল আমার মাথার সব চুল খাড়া হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি জিব আর মুখ ভালোকরে ধুয়ে সেজমামাকে বললাম—আমরা এর নাম জানিনা। তুমিই বলো। তবে এর নাম 'বেলগাছিয়াম' রাখা যেতে পারে, হাজার হোক বেলগাছিয়ার আম তো!

সেজমামা উত্তর দিল ''ধ্যুৎ, এর নাম হল কাক দেশান্তরী আম।"

আমরা প্রায় সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম মানে?

সেজোমামা পাকা গোঁফের তলায় ফিচেল হাসি হেসে বলল ''এই আম একবার ভুল করে খেলে কাকও দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পালায়। তাই এর নাম হল কাক দেশান্তরী আম।

বোঝো!

একটু হাসো

কো-আক্

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

এ গল্প বেশ কিছুদিন আগের। তখন যতবার খুশী ম্যাট্রিকুলেশন (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় বসা যেত। খগেন পরপর সতেরো বার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পরও পাশ করতে পারল না। শেষবারে সমস্ত বিষয় মিলে এগারো নম্বর পেল। তখন খগেনের বাবা নগেনচন্দ্র খুব রেগে গেলেন। এদিকে একমাত্র ছেলের দাড়িতে পাক ধরা শুরু হয়ে গেছে, অথচ বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে খগেনের মা মোক্ষদাসুন্দরীও খগেনের বাবার উপর রেগে গিয়ে যা মুখে এল তাই বলে গালাগালি দিতে লাগল। সব দেখেশুনে নগেনবাবু স্কুলের কর্মশিক্ষার শিক্ষক প্রতিবেশি খাঁদু পালের কাছে বুদ্ধি নিতে গেল। খাঁদু-মাস্টার বুদ্ধি দিল যে তার শালার কাছে কিছুদিন থেকে যদি হাতুড়ে ডাক্তারীটা শিখতে পারে, তাহলে খগেনের ভাত মারে কে? সুতরাং খগেনকে যথারীতি খাঁদু পালের শালা প্রখ্যাত হাতুড়ে ডাক্তার যাদবেন্দ্র তা ওরফে যদু ডাক্তারের সাগরেদি করতে পাঠানো হল।

যদু ডাক্তার রোগী দেখতে যাচ্ছেন, সঙ্গে খগেন। কথা হয়েছে রোগী দেখে ফেরার পরে রোগ নিয়ে আলোচনা করে সব শিখে নেবে খগেন। রোগীটি ছিল ক্রনিক অম্বল-আমাশা ভোগী। এসব ক্ষেত্রে যা হয়—রোগী পথ্যের কোন নিয়ম মানে না। রোগীর বাড়ি পৌঁছে রোগীকে দেখে-টেখে যদু ডাক্তার আচ্ছা করে ধমক লাগালেন। বললেন,

'আমার কথা না শুনলে চিতার কাঠ কাটুন, আমাকে আর ডাকবেন না।"

—"ডাক্তারবাবু, আমি তো আপনার সব ঔষধই খাই, সব কথা শুনি।"

—"মোটেই না। আমি আপনাকে বলেছিলাম যে চপ-মুড়ি একদম খাবেন না। আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে চপ-মুড়ি খান। ইয়ারকি হচ্ছে?"

অনেক বকাবকি, উপদেশ, রোগীর স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে একটা অম্বলের ওষুধ লিখে দিয়ে যদু ডাক্তার ভিজিটের টাকাটি পকেটে পুরে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফেরার পর যথারীতি খগেন জিজ্ঞাসা করল,

—"ডাক্তারবাবু, আপনি কি করে বুঝলেন যে রোগী চপ-মুড়ি খেয়েছে?"

—"আরে বাড়ির গলির সামনেই তো চপ-মুড়ির দোকান। আর রোগীর খাটের তলায় মুড়ি পড়েছিল কয়েকটা। তাই দেখে বুঝে নিলাম সবকিছু।"

এর কদিন পরে যদুবাবু বিশেষ কারণে শ্বশুরবাড়ি গেলেন। অন্যসময় যদুবাবু না থাকলে চেম্বার বন্ধ থাকে, কিন্তু খগেন বলল যে সে চালিয়ে নেবে। তাই চেম্বার বন্ধ করার দরকার নেই। এরপর সেইদিন বিকেলবেলা খবর এল সেই অম্বল-আমাশা রোগীর বাড়াবাড়ি অবস্থা। যদু ডাক্তার নেই, তাই জুনিয়র ডাক্তারবাবু খগেনকে রোগীর বাড়ির লোক ডেকে নিয়ে গেল। খগেন গিয়ে রোগী দেখার পর রোগীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মুখে একটু পায়চারী করে ফিরে এল। এরপর খগেন রোগীকে আর রোগীর বাড়ির লোককে আচ্ছা করে বকাঝকা শুরু করে দিল। সবাই বলল, —"ডাক্তারবাবু, রোগীতো আর চপ-মুড়ি খায়না। তাহলে এত বকাবকি করছেন কেন?"

—"আবার কথা। নিয়ম মেনে খাওয়া দাওয়া করতে বলা হয়েছিল না!"

—"তাইতো করছি ডাক্তারবাবু", রোগী বলল।

—"তাই নাকি? ইয়ারকি হচ্ছে? লুকিয়ে লুকিয়ে জুতো খাচ্ছেন আপনি। আপনার বাড়ির গলির সামনে জুতো দোকান, আর আপনার খাটের তলায় তিনজোড়া জুতো।"

গল্পের গোরুর উৎস

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

('গল্পের গোরু গাছে ওঠে' প্রবাদটি সবাই জানেন। এই প্রবাদটির উৎস কেউ জানেন কি? জানেন না তো? আজ জেনে নিন)।

একটি শান্ত-শিষ্ট গোরু মাঠে চরে চরে ঘাস খাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে লেজ নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছিল। মাঠের প্রান্তেই ছিল এক ঘন জঙ্গল। এমন সময় সেই জঙ্গল থেকে বেরোল এক ক্ষুধার্ত বাঘ। বাঘের যা স্বভাব—চুপি চুপি গোরুর পেছনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। উদ্দেশ্য—গোরুটিকে শিকার করে খাওয়া। ঘাস খেতে খেতে গোরুটি গন্ধ পেল বাঘের, আর ঘাড় ফিরিয়ে বাঘ দেখেই সে চোঁ চোঁ করে সোজা দৌড় লাগাল। সামনেই ছিল এক উঁচু তালগাছ। প্রাণের ভয়ে গোরুটি তড়িঘড়ি করে তালগাছে চড়ে একদম মগডালে গিয়ে বসে থাকল। গোরুকে তাড়া করে বাঘ তালগাছ অবধি এসেও ধরতে পারল না, দু-একবার গাছে চড়ার চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারল না। কিন্তু সেজন্য বাঘ কিন্তু হতাশ হল না। সে তালগাছের চারিদিকে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল, আর বলতে লাগল "ব্যাটা গোরু, গাছ থেকে তো তোকে নামতে হবে। একবার নাম, তারপর দেখাচ্ছি মজা।"

এদিকে গোরুতো গাছের তলায় বাঘ দেখে মোটেই নামতে রাজী নয়। এভাবেই কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা। এরপর একসময় গোরুটির প্রস্রাব পেল। গাছে চড়া অবস্থাতেই সে প্রস্রাব করতে শুরু করল। গোরুর প্রস্রাব সুতোর মতো আকার নিয়ে নিচে পড়তে লাগল। সেই প্রস্রাব সুতো ধরে ধরে বাঘ ঝুলে ঝুলে উপরে উঠতে লাগল। উদ্দেশ্য—একবার গোরুর কাছাকাছি পৌঁছতে পারলেই কেল্লা ফতে করে দেবে। বাঘ সেই প্রস্রাব-সুতো ধরে ধরে গোরুর একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেল—আর একটু পরেই গোরুকে ধরে নেয় আর কি! এমন সময় গোরুর চোখ পড়ল বাঘের দিকে। ভয়েই তার প্রস্রাব পড়া বন্ধ হয়ে গেল। প্রস্রাব-সুতো হঠাৎ কেটে যেতেই বাঘ উঁচু থেকে দুম করে নিচে মাটিতে পড়ে গেল, আর ছটপটিয়ে মরে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে গোরু তালগাছ থেকে নেমে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

তবে যাবার আগে মৃত বাঘের মুখে একটা ল্যাং মেরে দিয়ে গেল।।

"একটু হাসো"



ইজ ইট এ জোক্?

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

ইংরেজ আমলের কথা। বড় এক দোকানের এক মাঝারি মাপের সাহেব কর্মচারী তারই এক বাঙালী সহকর্মীর নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তার গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের এক কচুরীপানা-টোকাপানা ভরা ডোবা-পুকুর, জল-জঙ্গলে ভরা এক গ্রামে ছিল সেই কর্মচারীর বাড়ী। অন্নপ্রাশন মিটে যাবার পরদিন সকালে প্রাতঃকৃত্য করার জন্য সেই ভদ্রলোক তার পুকুর-পাড় দেখিয়ে দিলেন। পুকুরটি ছিল কচুরিপানা আর জোঁকে ভরা। সাহেব যথারীতি সবরকম কাজকর্ম সেরে ফিরে এলেন। এসেই প্রথমে উস্‌খুস্, পরে ছটফট্ করতে লাগলেন। এরপরের কথোপকথন ছিল এরকম—

= *Oh! I am feeling irretation! What is this?*

— সাহেব, বুস্‌সি। জোঁক লাগসে।

= *What? Joke!*

— হ্যাঁ সাহেব, জোঁক।

= *You idiot! It is already three inches inside, and you are telling it is a joke!*

মহিষ কখন সিংহ খায়

পুজোর ছুটি শেষ। স্কুল খুলেছে। আমাদের রসিক মাস্টারমশায় খগেনবাবু ক্লাসে ঢোকার সময় আমরা সবাই হইচই করছি দেখে বললেন—

'কিরে, এতো হইচই করছিস কেন?'

— 'স্যার, এবার আমাদের গ্রামের পুজোর সিংহটা মহিষের চেয়ে সাইজে বড় ছিল। সেই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সিংহ কি মহিষের চেয়ে বড় হয়? নগেন বলছে, সিংহ সাইজে ছোট হয় মহিষের চেয়ে। তাহলে সিংহ মহিষকে খায় কি করে? —গণেশ বলল।

'তাহলে তোদের সমস্যা হল সিংহের মহিষ ভক্ষণ। দুর্গা ঠাকুরের পায়ের তলায় তো দেখলি সিংহ মহিষ খাচ্ছে। বলদিকি মহিষ কখন সিংহ খায়?'— মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

সবাই অনেকক্ষণ ধরে মাথা চুলকেও উত্তর বের করতে পারলাম না। মাস্টারমশাইকে সঠিক উত্তরটা বলে দেওয়ার জন্য জেদাজেদি করতে লাগলাম।

মাস্টারমশাই বললেন— 'ক্লাসরুমের জানালার বাইরে শেয়ালমারীদীঘির চড়ার দিকে তাকা, উত্তর পেয়ে যাবি।'

আমরা হুড়মুড়িয়ে জানালার ধারে জড়ো হলাম। দেখলাম, বিসর্জন দেওয়া দুর্গামূর্তি থেকে বেরিয়ে আসা মোটাসোটা খড়ের পুটুলি দিয়ে তৈরি করা সিংহের 'বডি' টেনে টেনে খাচ্ছে একটা মহিষ।

তেল

শিবব্রত পট্টনায়েক

তেল কয় প্রকার? সর্ষের তেল, নারকেল তেল, রেড়ির তেল, রেপসীড তেল, পাম তেল, সূর্যমুখী তেল, কুড়োর তেল—মায় শিয়ালকাঁটার তেল—এসব ছাড়াও কেরোসিন তেল-টেলও আছে। তেল কী কাজে লাগে—তারও একটা সহজ হিসেব আছে। আজকের তেল অবশ্য এগুলোর কোনটাই নয়, আবার প্রয়োগের ধরণ অনুযায়ী যেকোন একটি অথবা সবগুলোকে একসঙ্গে বোঝাতেও পারে। এ তেল হল তৈলমর্দনের তেল। না—বাবুমশায়ের শরীরে চাকর-মোসায়েব দ্বারা মর্দন করার সময়কার ব্যবহৃত তেল, অথবা কৃপালাভের ক্রয়-বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে সেইমতো যোগানো 'তেল'ও নয়; এ হল কাজ উদ্ধার করার জন্য বাবু-সাহেবদের অন্তরে লাগানো মুখনিসৃত 'বাণী'র 'তেল'। 'শত-কথায় সতী জব্দ, আর মিষ্টি কথায় বাকী সবাই'— না, বিষয়টা আজকাল অ্যাতো সহজ নেই আর, তেল লাগানোর কাজে পাত্রভেদ, মাত্রাভেদ ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক নিয়ম-কানুন হিসেব-নিকেশ আছে। ঠিক জায়গায় ঠিকমতো লাগাতে পারলে এই তেলের কার্যকারিতা যেমন অসীম অবধি প্রসারিত হতে পারে, তেমনি বেঠিকজায়গায় বা বেঠিকভাবে লাগানো হলে এই তেলে হিতে বিপরীতও হতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প আছে।

এক সরকারি অফিসের কনট্রাক্টরদের নানান ধরণের বিল পাস হয়। এক্ষেত্রে যা— অফিসের সব কর্মচারীর সাপ্তাহিক 'উপরি' রোজগার মাসিক বেতনের চেয়েও বেশি। তো এইরকম এক অফিসে এক কমবয়সী কড়া ধাতের অফিসার এসে সবাইকে বিপদে ফেলে দিয়েছেন। সব কর্মচারীর সংসারে হঠাৎ করে দাম্পত্যকলহও আমদানি হয়ে গেছে। নানান ধরণের উপঢৌকন, রাজনৈতিক চাপ, ভয় দেখানো ইত্যাদি কর্মচারী সিধে করার বহু পরীক্ষিত অস্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয়ে গেছে— ফল কিছু হয়নি। সবার মাথায় হাত! বকেয়া পড়ে থাকা প্রতিটি বিলের ব্যাপারে অফিসার ভদ্রলোক গোড়া থেকে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করেছেন, নিজে সবকিছু দেখতে চাইছেন। সবাইকে ভাগ দিয়ে সর্বনিম্ন দরপত্রে কাজ করতে গিয়ে কিছু করার থাকে না বলে কনট্রাক্টররা আর কিছুই করেন না, কর্মচারীদের উপযুক্তি দক্ষিণা দেওয়ার পর তাদের সহায়তায় শুধু বিলটা তৈরি করেন। এহেন অবস্থায় বিলের টাকা না পেলে তাদেরও বা চলবে কী করে? এদিকে অফিসের বড়বাবু পর্য্যন্ত 'স্যার স্যার' করতে গিয়ে তেল লাগানোর অপবাদসহ অফিসারের ধমক খেয়েছেন। কাজেই সবার একটাই চিন্তা—কী করা যায়? অফিসারতো কারোর কোনও কথা শুনতেই চাচ্ছেন না, কাউকে কাছে ঘেঁসতেও দেন না, তাই ওনার সঙ্গে কোনও কথাই কেউ বলতে পারছে না। এরপর সবাই মিলে এক বহুদর্শী বয়স্ক ভদ্রলোককে ধরলেন, যিনি সারাজীবন ধরে শুধুমাত্র ধুরন্ধর বুদ্ধি খরচ করে সফল ভাবে কনট্রাক্টরী ব্যবসা চালিয়েছেন, আর এখন ছেলের উপর ব্যবসার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোক সমস্যাটি শুনে মুচকি হেসে সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, পরের দিন দুপুরে কার্ড পাঠিয়ে পারমিশান নিয়ে সাহেবের অফিস ঘরে হাজির হলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে অফিসার-মহোদয়ের কথোপকথন ছিল এরকম—

—আসতে পারি, স্যার?

— কী ব্যাপার?

— তাহলে সার পরে আসবো। আপনি ব্যস্ত আছেন ...

— না। আসুন। বসুন। বলুন কী বক্তব্য আপনার? প্রথমেই জেনে রাখুন, আপনার ফেবারে কোনও আইনবিরোধী কাজ করার জন্য অনুরোধ করবেন না।

— ওসব নয় সার। আমি শুধুই দেখতে এলুম।

— দেখতে? কী দেখতে?

— সার, আপনাকে দেখতে।

— আমাকে দেখতে? কেন? আমি কী অদ্ভুত দর্শন কোনও জীব নাকি?

— ছি ছি সার। কী যে বলেন! ওসব কিছু নয়। আসলে আপনার সম্পর্কে কিছু কথা শোনার পর আমার আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছে হল। দেখুন সার, আমার অনেক বয়স হয়েছে, জীবনে অনেক দেখেছি, তবে সার আপনাকে আজ দেখে আমার এই বয়সে এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো।

— কী অভিজ্ঞতা?

— সার, কোনও মানুষ যে এতোটা সৎ হতে পারেন, কারো কাছে কোন ঘুষ-টুসতো দূরের কথা, কোনরকম চাটুবাক্য,

মানে আমরা যাকে বলি তেল দেওয়া— তাও পছন্দ করেন না, এরকমটা যে আদৌ ঘটতে পারে, তাই কোনদিন শুনিনি। আপনার মতো কোনও মানুষ যে হতে পারেন, এটা জানাই একটা অভিজ্ঞতা।

— তা বেশ। এজন্য আমি কী করতে পারি?

— না, না সার। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। ক'রবতো আমি। আমি এই অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে বলব। আজকের দিনে আপনার মতো মানুষ— এ এক দৃষ্টান্ত! না না সার, আপনার অস্বস্তি হওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে সার আমার একটা অনুরোধ আছে।

— অনুরোধ! কিসের অনুরোধ?

— না না সার! তেমন কোন ব্যাপার নয়। আমি তো এখন কর্মহীন বেকার মানুষ, আপনার মতো মানুষের সঙ্গে দু-মিনিট কথা বলতে পাওয়াও আমার কাছে অনেক। তাই মাঝে-মধ্যে আপনাকে একটু দেখতে আসতে চাই। অনুমতি দেবেন তো সার?

— (একটু অন্যমনস্কভাবে) আচ্ছা ... আসবেন।

এরপর বাকী কথা—আপনাদের সবার জানা। সুঁচ আর ফালের কী একটা উপমা আছে না? ❐

গল্প

একটি নী-রস ঘটনা

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

জানলাম, বীরুবাবু বাণপ্রস্থে গেছেন। বাণপ্রস্থে, মানে বৃদ্ধাশ্রমে গেছেন। এমনিতে হয়তো বিষয়টিতে নূতন কিছুই নেই, কিন্তু এ'ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। বীরুবাবু আমাদের কলেজে পড়াতেন। উনি সু-শিক্ষিত, স-সম্মানে সারাজীবন প্রফেসারী করে গেছেন। ওনার সন্তান-ভাগ্যও খুবই ভালো। একমাত্র ছেলে পদার্থবিদ্যায় Ph.D. করে এখন প্রেসিডেন্সীর শিক্ষক। স্যার ঠিক নীতিবাগীশ না হলেও দুর্নীতির সঙ্গে কোনোদিন আপোশ করেছেন বলে শুনিনি। ওনার স্ত্রী বহুদিন আগেই গত হয়েছেন। ছেলে-বৌমা দুজনেই খুব ভালো, বৌমাও চাকুরী করেন সল্টলেকে, সেক্টর V-এ। খুবই যত্ন নেন শ্বশুর মশাইয়ের। এইরকম একজন মানুষ বৃদ্ধাশ্রমে যাবেন, ভাবা মুশকিল। দারুণ কৌতুহল নিয়ে আমি আর অমিত গত রবিবার গিয়েছিলাম স্যার-এর সঙ্গে দেখা করতে, বৃদ্ধাশ্রমে।

কিছুক্ষণ নানান বিষয়ে আলোচনার পর অমিত স্যারকে জিজ্ঞাসা করল ওনার এই বৃদ্ধাশ্রমে আসার কারণ। প্রথমে স্যার কিছুতেই এই বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলেন না। অনেক সাধাসাধির পর উনি মনের মধ্যে জমে থাকা আবেগ কিছুটা খালি করলেন আমাদের সামনে।

—দ্যাখো অমিত, তোমরা তো আমাকে জানো। আচ্ছা, কখনও কি তোমাদের মনে হয়েছে যে তোমাদের স্যার একটি উজবুক বা আধপাগল?

—না স্যার। আমাদের চিরদিন উল্টোটাই মনে হত। বোধ হয় আপনার সব প্রাক্তন ছাত্রই এ কথা বলবে। আপনি প্রতিদিন ক্লাস শেষ হওয়ার পর নোট ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন যে পরের ব্যাচকে পড়ানোর সময় আপনি নতুন করে নোট বানাবেন। পুরানো নোট থাকলে আপনি নাকি অলস হয়ে যাবেন। আপনার কাছ থেকেই আমরা বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণা সম্পর্কে জানতাম। বোধহয় আমাদের সমস্ত ছাত্রের চেয়েও আপনি বেশী সময় কাটাতেন লাইব্রেরীতে। তাহলে আপনার এরকম মনে হচ্ছে কেন?

—আর কেন! তোমরা তো জানো আমার ছেলে বা বউমা আমাকে খুবই যত্ন করে। ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি এখানে আসার সিদ্ধান্ত জানাতে ওরা দুজনেই কান্নাকাটি করছিল। কিছুকেই আসতে দিচ্ছিল না।

—তাহলে এলেন কেন?

—কি করে তোমাদের বোঝাই বলতো!

—বলুন না স্যার।

—আমি চলে এসেছি কারণ নিজেকে প্রতিদিন একটি ব্যাকডেটেড, গাড়োল বলে মনে হচ্ছিল বলে। নিজের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতাকে মেলাতে পারছিলাম না বলে।

—কেন স্যার?

—তোমরা তো জানো, আমার দুই নাতি-নাতনি দুজনেই পিঠোপিঠি এখন দুজনেই বড়ো হয়েছে। ওর বাবা-মা হোম ইউনিভারসিটিতে ওদের ভর্তি করিয়েছে।

—তাতে কি হোল?

—না তাতে কিছু হয়নি, জানিনা তোমাদের ঠিক বোঝাতে পারবো কিনা। আগে ছিল সজারু-ছাঁট চুল। ক'মাস আগে নাতি আমার মাথার দু'দিক ন্যাড়া করে এল, এক কানে লাগিয়ে এল লোহার দুল। এদিকে গোটা হাতে-ঘাড়ে-পিঠে কিসব চিত্র-বিচিত্র আঁকা। কলেজে যায় হাফ-প্যান্ট পরে। তো একদিন বললুম---হ্যাঁরে, তুই এরকম স্টেগোসরাসের পিঠের মতো চুল রেখেছিস কেন?

নাতি তো প্রথমে কিছু বুঝতেই পারলো না। ওর বাবা স্টেগোসরাস কি তা জানে। ছেলেবেলা

অরণ্যদেব কমিকস্‌ও পড়েছে। তাই বলে দিল এ'টি একটি একটি ডাইনোসর।

নাতি আমার রেগে কাঁই!

এ'দিকে নাতনি তো অনেকদিন ধরেই আমার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। দ্যাখো, আমার বৌমাও জিনস্‌ পরে অফিস যায়। এটা ব্যবহার করা সহজ, পরে বাইরে বেরনো সহজ। তবে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয়, কারণ এতে ময়লা বোঝা যায় না। নাতনি পরতো ছেঁড়া আর ফাটা জিনস্‌। তারপর শুরু করল লেগ-ইন পরা। চুলে বিচিত্র সব রং-করা। ঘরে-বাইরে সব-সময় হাতে মোবাইল আর কানে প্লাগ লাগানো। নাতনির এইসব পোশাক পরে বাইরে যাওয়া আর বাড়ীতে সবসময় হাফপ্যান্ট পরে থাকাটা আমার ঠিক সহ্য হয় না। সেদিন দেখলাম নাতনি পরেছে একটা নতুন ধরনের জামা। তো বললুম—এটা কি নতুন ডিজাইন নাকি? মনে হয় কোন ডাক্তার ডিজাইন করেছে। ইন্‌জেকসন দেওয়ার জায়গাটা ফাঁকা রেখেছে।

নাতনি রেগে আগুন।

বুঝলে, বছর দেড়েক আগের একটা ঘটনা শোনো। একদিন নাতিকে দেখলাম একটু বেশী সাজগোজ করতে। জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁরে, কোথাও কোন স্পেশাল প্রোগ্রাম আছে নাকি? নাতির উত্তর—না দাদু, আজ আমাদের আন্দোলন। আমরা সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দোবো আন্দোলন কাকে বলে! সমস্ত অচলায়তন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে।

শুনে ভালো লাগলো। যাক, নাতি আমার অন্ততঃ নিজেকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবতে শিখেছে। সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধা, ক্ষমতাশালীদের, দুর্নীতিবাজদের অত্যাচার—এসব তাহলে ওকে ভাবাচ্ছে। তাই একটু বিষদে জানতে জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁরে, তোদের আন্দোলন কি নিয়ে? আজ কি করবি?

—আমাদের আজ 'কিসি' আন্দোলন।

—মানে?

—আমরা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা একে অন্যকে ধরে কিস্‌ করবো। ভেঙ্গে ফেলবো তোমাদের বুড়োদের এই অচলায়তন।

—ঠিক বুঝলাম না। একটু খুলে বল।

আমার নাতি খুলে বলল। চেনা-আধচেনা-অচেনা ছেলে-মেয়েরা নাকি আলিঙ্গন করবে আর জিবে জিব ঠেকাবে। এটাই আন্দোলন। শুনেই আমার গা-গুলোতে লাগল। বললাম—তোর বোনও যাবে নাকি?

নাতির উত্তর—নিশ্চয়ই।

অমিত আর আমি খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবতে থাকলাম স্যারের অবস্থাটা। তারপর অমিত জিজ্ঞাসা করল।

—স্যার, এজন্যই কি চলে এলেন এখানে?

—না। শুধু এজন্য নয়। আরো অনেক দৈনন্দিন ঘটনা আছে। যেমন ধরো আমার ডায়াবিটিস রয়েছে। মাঝরাতে বাথরুম যেতে হয়। আমার নাতনির সামনে পরীক্ষা। রাত আড়াইটা নাগাদ বাথরুম থেকে ফিরতে গিয়ে দেখি ওর ঘরে আলো জ্বলছে। ভাবলাম রাত জেগে পড়ছে। গিয়ে দেখি বিছানায় এলিয়ে বসে মোবাইলে কিসব করছে। জিজ্ঞাসা করলুম—কি করছিস রে?

—দাদু, Facebook করছি।

এরপর যখন বললাম—পরীক্ষার আগে অকারণ রাত জেগে কি লাভ, তো নাতনি আমায় বুঝিয়ে দিল—শুধু পড়ার বই পড়ে জ্ঞান লাভ করা যায় না, এইসব Mobile কাজকর্ম না জানলে নাকি জীবনে কিছুই জানা হয় না।

—স্যার, তারপর কি হোল?

—কিছুই হয়নি। আমি ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।

—স্যার, এটাই কি আপনাকে চালিত করল বাড়ী থেকে এখানে চলে আসতে?

—না, ঠিক তা নয়, আরো অনেক ছোটখাট ঘটনাও আছে। যেমন ধর আমার নাতির গান শোনা। তোমরা তো জানো আমি রাগ সঙ্গীতের ভক্ত। আর আমি কানে হুক লাগিয়ে গান শুনতে পারি না। যখন গান শুনি, সঙ্গে সঙ্গে নাতি-নাতনি

গলা ভেঙ্গায়। ভাবলাম, ওদের ভালোলাগার গান আমি শুনলে হয়তো ওরা এরকম করবে না। তো একদিন নাতির ঘরে ওদের গান শুনতে গেলাম। গান শুনে মনে হল গায়ক বোধহয় আমাকে মারতে আসবে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—এ হল 'র‍্যাপ'।

বুঝলে, সত্যিই বোধহয় আমি এযুগের কিছু বুঝিনা। Totally backdated। আমি এ বয়েসে আর ওদের সমস্যার কারণ হতে চাই না, তাই চলে এলাম।

আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্যারকে বোঝার চেষ্টা করলাম। এরপর প্রণাম করে বেরিয়ে আসার সময় স্যার আমাদের মাথায় হাত ছোঁয়ালেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। ফিরে আসতে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে এক ঝলক দেখে নিলাম আমাদের প্রিয় শিক্ষককে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এক মানুষ হয়ে বসে আছেন।

ডাঃ বিরূপাক্ষ মুখার্জী
M.Sc. (1st Class 2nd), Ph.D. (Ednb.)

সংকেত

ডাঃ শিব্রবত পট্টনায়েক

দিনের পর দিন সারাক্ষণ তিতিবিরক্ত থেকে এভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না সমীরণ। নানান কাজের ঝামেলায় দিনের বেলাটা যাহোক করে কেটে যায়, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা কোয়ার্টারে ফিরে আসার পর থেকে ভাবনাগুলো মাথা জুড়ে জাঁকিয়ে বসে, তাড়াতে গেলেও বার বার ফিরে ফিরে আসে, আর অসহ্য যন্ত্রণার ঝড় যেন সারা মন জুড়ে বয়ে যায়। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে ভাগ্য ব্যাপারটাতে বিশ্বাস করার কোন কারণ কোন দিন খুঁজে পায়নি, অথচ এখন মনে হয় জীবনের এই দুর্গতি বোধহয় ভাগ্যই নিয়ন্ত্রণ করছে, তা না হলে ছেলেবেলা থেকে হাজারো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে আজকে একটা নিশ্চিত আর্থিক স্বচ্ছলতার ঘোরাটোপের মধ্যে পৌঁছেও জীবন এরকম অর্থহীন হয়ে গেল কেন? জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোকে নাড়াচাড়া করে কোন বড়সড় ভুল বা অন্যায় কাজের কথা মনে পড়ল না তার। বিয়ের আগে মেয়েদের সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারে থেকে ছেলেবেলা থেকে লড়াইয়ের ময়দানের একবগ্গা ঘোড়ার মতো যুদ্ধ চালাতে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ফুরসত হয় নি, প্রেম-ফেম করাতো অনেক পরের ব্যাপার। সেজন্যই কি জানা বোঝার শিক্ষাগুলো সবই ভুল আর তাই এই দুর্ভোগ? নাকি রমা দিনরাত যা বলতে চাইতো সেটাই হয়তো বা ঠিক-গায়ের রং আর আকৃতি দেখে মেয়েরা ঘেন্নায় কাছে আসেনি। কিন্তু কলেজের সহপাঠী বা জুনিয়র মেয়েদের অথবা সামাজিক নানান অনুষ্ঠানে মেয়েদের সঙ্গে যেটুকু কথাবার্তা হয়েছে, তাতে তো এরকম কিছু কখনও মনে হয়নি। নিজেকে আয়নায় সবাই সুন্দর দেখে, কিন্তু তাহলেও কেউ তো কোনদিন বলেনি যে সমীরণ দেখতে খুব খারাপ। নাকি সায়ন্তনরা যা বলে সেটাই ঠিক—মেয়েদের বিয়ের আগে কোন ছেলের সাথে প্রেম আর শারীরিক সম্পর্ক হয়ে গেলে পরে অন্য কোন ছেলের সাথে চাপ দিয়ে বিয়ে দিলে বিয়ের পর স্বামীকে কোনদিন তার আর্কষণীয় মনে হবে না, উঠতে বসতে শুধু দোষগুলোই চোখে পড়বে। তাই যদি হয়, তাহলেও এর পেছনে নিজের দোষটা কোথায় সমীরণ তা হাজার চেষ্টা করেও খুঁজে পাচ্ছিল না। পরিচিত এক ঘটকের খোঁজ দেওয়া সামাজিক বিয়েতে মত দেওয়ার মধ্যে অন্যায়টা কোথায়? বন্ধুরা বলে বিয়ের আগে ঠিকমতো খোঁজখবর নিলে কিছু কিছু খবর নিশ্চয়ই জানা যেতো, আর তাহলে বিয়ে হত না, সমস্যাও হত না, অনেক চিন্তা করেও সমীরণ বাবা-মায়ের বিশেষ কোন খোঁজ খবর না নিয়ে এককথায় বিয়েতে রাজি হয়ে যাওয়ার মধ্যেও কোন দোষ খুঁজে পেল না। হয়তো নিজের ছেলের সাধারণ চেহারা আর চাপা গায়ের রঙের কথা ভেবে সুন্দরী রমাকে ছেলের বৌ করার জন্য একটু বেশি উদ্যোগী হয়ে পড়েছিলেন ওনারা। সেটা কি খুব দোষের কিছু? এমনতো নয় যে রমা বিয়ের আগে হবু বরকে দেখেনি বা কোন কিছু গোপন করে বিয়ের কথাবার্তা চালানো হয়েছে। বিয়ের পরে অবশ্য এই কথাগুলোই সবসময় বলতো রমা। নিজের প্রয়োজন হলেই এভাবে ডাহা মিথ্যে কথা অম্লানবদনে বলে চলতে মানুষ যে পারে, সমীরণের সেই অভিজ্ঞতা আগে ছিল না। নাকি বন্ধুদের কথাটাই ঠিক—সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারের বেতনের অঙ্কটাই তখন রমার ইস্কুল মাস্টার বাবা-মা আর রমাকে লোভে ফেলে

দিয়ে সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর পর রমার অতীত জীবনের নানান খবর বয়ে আনা বেনামী চিঠিগুলো হাজারো সন্দেহের জন্ম দিলেও অনেক চেষ্টায় সেগুলোকে চেপে রেখে অতীতকে অতীত হিসাবে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করেও তো কোন লাভ হল না। এতো কিছুর পরও রমার ওপর বিশ্বাস রাখাটাই বোধহয় কাল হল। ডিউটিতে বেরিয়ে যাওয়ার পর পর প্রায় প্রতিদিন রমা বেরিয়ে যেত—দারোয়ান বহুবার ইঙ্গিতে একথা জানাবার পরও রমার মার্কেটিংয়ে যাওয়ার কথায় বিশ্বাস করাটা বোধহয় ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনদিন বাবার বাড়ী যাওয়ার নাম করে যে অ্যাবর্সান করাতে যাবে, আর সেকথা মাসিকে দিয়ে ফোন করিয়ে জানাবে, এটা ভাবতে গিয়ে এখনও কষ্ট হয় সমীরণের। দু'বছর ধরে হাজারো বোঝানোতে কাজ না হওয়ায় একরকম জোর করে বাচ্চা নিয়ে আসার চেষ্টাতেও কোন কাজ হল না। বন্ধুদের কারো কারো মতে রমার অবিবাহিতা মাস্টারণী মাসিটাই আসল শয়তান, কারোর মতে ওর মায়ের ইতিহাসও খুব নোংরা, আর একজনতো বলেই দিল এ হল রক্তের দোষ। সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, এ যুগের একজন শিক্ষিতা মেয়ের কাজকর্মের মধ্যে কোন যুক্তি থাকবে না, এটা কি করে সম্ভব? নাকি অভয়কাকুর কথাই ঠিক, এযুগে ডিগ্রী আর শিক্ষা সম্পূর্ণ দুটো আলাদা বিষয় হয়ে গিয়েছে।

বধু অত্যাচারের কয়েকটা ধারার কেসের কারণে গ্রেফতারী এবং সাধারণ সরকারি চাকুরে বাবার আর নিজের সাসপেনশনের হাত থেকে বাবার বাল্যবন্ধু অভয়কাকুই আগাম জামিনের ব্যবস্থা করে রেখে দিয়ে বাঁচালেন, নাহলে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো তা ভাবতে গেলে এখনও সমীরণের আতঙ্ক হয়। রিটায়ার করার তিনমাস আগে সাসপেন্ড হয়ে গেলে বাবাতো পেনসনও পেতেন না। সমীরণ ভাবলো—এ দেশের এ কেমন নিরপেক্ষ আইন, যেখানে রমা তার সেই প্রেমিকের সঙ্গে প্রায় লিভ-টুগেদার করে আছে, অথচ ডিভোর্সও দেবে না, আর সমস্ত আইন তারই পক্ষে। আইনের মতে নাকি কোন শক্তপোক্ত প্রমাণ ছাড়া রমার এই জীবনযাপন নিয়ে কিছু বলার বা বাধা দেওয়ার কোন অধিকার নেই তার। সেরকম কিছু করতে গেলে আরো মারাত্মক ধরনের মিথ্যে কেসে ফেঁসে যেতে হবে, যেখান থেকে বেরোন খুব কঠিন। অভয়কাকু এতো বিখ্যাত ব্যারিস্টার হয়েও বলে দিলেন যে আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী মহিলারা নাকি সর্বদাই নির্যাতিতা, কখনওই নির্যাতনকারী হতে পারেন না, অন্ততঃ আইন তাই মনে করে। মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কেবলমাত্র পুরুষের মধ্যেই থাকে, এ'কথার উপর নির্ভর করে কি করে কোন সভ্য দেশের আইন তৈরি হয়, হাজারো চিন্তা করেও সমীরণ তা বুঝতে পারল না।

নিজের দিনযাপনের এই গ্লানি আর হতাশার মধ্যে আদর্শবাদী বাবার কথা ভেবে মাঝে মাঝে রাগে মাথা ফেটে যেতে চায়, যখন মনে হয় ছেলেবেলা থেকে চরিত্রগঠন, সংযত আচরণ, মেয়েদের থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখা, সম্মান করা—এসব শুনে শুনে এমন মানসিকতা হয়ে গিয়েছে যে হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে রমার স্তরে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না, পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকে এক অদৃশ্য দেওয়াল। কনট্রাসেপটিভগুলোর আবিষ্কার অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা করেছে নাকি স্বেচ্ছাচারী, কদাচারী হওয়ার পথে মেয়েদের উৎসাহিত করেছে, নিজে ডাক্তার হয়েও সমীরণ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল না।

★ *একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। নামগুলোই শুধু কাল্পনিক।*

পাড়ি

শিবব্রত পট্টনায়েক



অনেক ক্ষণ ধরে বিছানায় পাশ ফিরে ফিরে ঘুমানোর চেষ্টা করে একসময় আকাশ বুঝল—আজ রাতে আর চোখে ঘুম আসার কোন সম্ভাবনা নেই। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে হোম সার্ভিসের না খোলা ফুড ক্যারিয়ারের প্যাকেটটা টেবিল থেকে সরিয়ে রেখে জলের বোতল থেকে বেশ খানিকটা জল খাওয়ার পর সিগারেট ধরিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আকাশ চেষ্টা করতে লাগল নিজের চিন্তা-ভাবনা গুলোকে খানিকটা অন্তত গুছিয়ে নিতে। ছেলেবেলা থেকেই নানান প্রতিকূলতার মধ্যে বড় হওয়া, দুর্ঘটনায় বাবা মারা যাওয়ার পর টিউশন পড়িয়ে মেসের খরচ যোগাড় করে চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়াশোনা করা, মায়ের মৃত্যু, আর তারপরের বেশ কয়েক বছরের বেকারত্ব আর বেকারত্ব কাটানোর তীব্র লড়াই করার দিনগুলোতেও কোনদিন নিজেকে এরকম হেরে যাওয়া আর ঠকে যাওয়া বলে মনে হয়নি। কষ্ট-যন্ত্রনার দিনগুলোকে পেছনে ফেলে আর্থিক স্বচ্ছলতা আর নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের ঘেরাটোপের মধ্যে জীবনের এই স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পর এরকম কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার কথা কল্পনাতেও কোনোদিন আসেনি। অথচ আজকের দিনটা শুরু হয়েছিল আর দশটা দিনের মতোই। সীমা অ্যাডভান্স অবস্থার শেষ দুটো মাস বাবার বাড়িতে কাটানোর জন্য চলে যাওয়ার পর থেকে দিন পনের যেমন চলছিল, আজকের দিনটাও তার থেকে আলাদা ছিল না। বিকাশের ফ্লাটে অফিস ফেরৎ আড্ডা সেরে বাসায় ফিরে আসা অবধি নিস্তরঙ্গ জীবনের ছন্দ স্বাভাবিক পথেই চলছিল। অভ্যাসমতো লেটার বক্স চেক করতে গিয়ে অজানা হাতের লেখা দেখে খামটা খোলার কৌতুহল মেটাতে গিয়ে সবই যেন ওলট-পালট হয়ে গেল।

চিঠিটা লিখেছে কোন এক নীলাঞ্জন—নামটা আসল কিনা কে জানে; অথচ চিঠিতে সীমা সম্পর্কে বর্ণনা এতো সঠিক, এতো ডিটেল, যে কোন ভাবেই ফালতু ব্যপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া সঙ্গের কাগজটা যে সীমারই হাতের লেখায় অতীতের কোন প্রেমপত্রের জেরক্সকপি, তাতেও সন্দেহ নেই। অথচ চিঠির বাকি কথা মনে এলেই আকাশের মাথার মধ্যে যেন বিস্ফোরণ

হতে শুরু করে—নিস্ফল আক্রোশে সমস্ত কিছুকে ভেঙে-চুরে ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে হয় তার। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আকাশের মনে হ'ল ফ্যানের তলায় বসেও তার মাথা-গা-সারা শরীর যেন গরমে পুড়ে যাচ্ছে। অস্থির হাতে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে শোয়ার ঘর ছেড়ে ছাদে উঠতে লাগলো সে। ছাদের আলসেতে ঠেস দিয়ে শহরতলির তারা ঝলমল অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে নিজের জীবনে যেন এক চরম শূন্যতার উপলব্ধি হ'ল তার। ধীরে ধীরে ছবির মতো মনে পড়তে লাগল গত বছর দেড়েকের দাম্পত্য জীবনের নানান খুটিনাটি। অনেক ভেবেও সীমার এত দিনকার কথাবার্তা, ব্যবহার বা কাজকর্মের মধ্যে কোন অসঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছিল না সে। এতোদিন একবারও মনে হয়নি সীমা নিজের কোনও দায়িত্বে ফাঁকি দিয়েছে; নিজেদের সম্পর্কের বোঝাপড়ার মধ্যে কোন ফাঁক আছে বলেও মনে হয়নি। আকাশের মনে পড়ল—বিয়ের পরপরই সীমা কয়েকবার কিছু বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তখন ধারণা হয়েছিল সীমা হয়তো তার কিশোরী প্রেমের ইতিহাস শোনাবে। সারা ছাত্র জীবনের প্রতিটি দিনই শুধু নিজের দুরবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার লড়াই লড়তে ব্যস্ত থাকতে হ'ত, তাই হয়তো মেয়েদের প্রতি মনযোগ দেওয়ার সময়, সুযোগ বা মানসিকতা তার ছিল না। কিংবা, আকাশ ভাবল, আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তৈরী হওয়া মনের গোপন কোণে লুকিয়ে থাকা অজানা কোন হীনমন্যতা বোধই তাকে সহপাঠিনীদের সাথে, অথবা জুনিয়র মেয়েদের সাথে সহজ সম্পর্ক তৈরী করার পথে মানসিক ভাবে বাধা দিত। অথচ মেয়েদের প্রতি বয়সের কারণে যে বিস্ময়বোধ বা কৌতুহল থাকে, তা তো তার ছিল পুরোমাত্রায়। পরিণত মনে সেগুলোকে ফালতু বলে মনে হলেও কলেজ জীবনে বন্ধুদের প্রেমের গল্পের দৈনিক বর্ণনাগুলো অন্য সবাইয়ের মতো তারও উপভোগ্য মনে হ'ত। সীমার না বলা কথাগুলোকে তাই কলেজী প্রেমের কোন ব্যপার বলে ধারণা হয়েছিল তার, সেজন্য এরকম কোন প্রেমের কোন পূর্বরাগ-অনুরাগের ইতিহাস জানার কোন ইচ্ছে তখন হয়নি। কিন্তু ব্যপারটা যে কলেজ পালিয়ে লজে রাত কাটানো পর্যন্ত যাওয়া কোন বিষয় হতে পারে, তা তখন কল্পনাতেও আসেনি। অথচ চিঠিতে লেখা দীঘার লজের নাম-ঠিকানা-তারিখ-রুমনাম্বার থেকে শুরু করে সীমার শরীরের গোপন অঙ্গের খুব কাছে থাকা ছোট্ট জড়ুলটার বর্ণনা পর্যন্ত পুরো ব্যপারটা মনে আসায় ঘেন্নায় আকশের শরীর শিউরে উঠল, আর সারা দেহ-মন সীমার প্রতি রাগে যেন ফেটে পড়তে চাইল, অসহ্য বিরক্তির মাঝে খোলা ছাদের উপর চিত হয়ে তারা ভরা অন্ধকার আকাশের দিকে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চেয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে স্নায়ুগুলো উত্তেজনা হারিয়ে একসময় কিছুটা ঝিমুনির ঘোর এনে ফেলল আকাশের চোখে। আস্তে আস্তে তাই নিজের মধ্যে ফিরে আসতে লাগল সে। চিন্তাগুলোর মধ্যে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরে আসার পর ছাদ থেকে নেমে বিছানায় ফিরে গেল আকাশ। বিছানায় মশারীর মধ্যে বালিশে ঠেস দিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে তার মনে পড়তে লাগল একই ঘরে একই বিছানায় কাটানো ফুলশয্যার রাত্রির স্মৃতিগুলো। সীমার সঙ্গে গল্প করে করেই প্রায় কাটিয়ে দেওয়া সে রাত বা তারপরের আরো অনেক রাতের কথাও মনে আসছিল তার। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার নামে কল্পনার ফানুস ওড়ানো, অকারণ খুনসুটি করা, আদর, কপট রাগ—দাম্পত্যের মধুর স্মৃতিগুলোর কথা মনের পর্দায় ভেসে চলার সময় সেগুলোর মধ্যে কোন ফাঁকি খুঁজে পাচ্ছিল না সে। ইউরিন টেস্টের দ্বিতীয় ব্যান্ড যেদিন সন্তানের আগমনবার্তা ঘোষনা করেছিল, সীমার সেদিনকার আনন্দকে কোন ফাঁকি বলে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। অথচ আজকের চিঠির কথাগুলোকেও অস্বীকার করার কোন রাস্তা দেখতে পাচ্ছিল না সে। ঘটনা কী, তা বোঝার পরেও আকাশ তাই তো বিশ্বাস করতে পারছিল না। সুন্দর, স্বপ্নময় এক দম্পতির মাঝে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কংক্রীটের প্রাচীর হয়ে হাজির হয়ে গেল এক সম্পূর্ণ অজানা মানুষ—এতো

যন্ত্রনার মাঝেও ঘটনাক্রমের ক্ষমতা, তীব্রতা আর আকস্মিকাতার কথা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে। নীলাঞ্জন যে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের কাছে এই সময় এরকম একটা চিঠি লিখল, তা থেকে মনে হয় বিয়ের পরের এতদিনকার সব খবর নিশ্চয়ই সে রাখতো; না হলে সীমাকে চরম বিপাকে ফেলার উদ্দেশ্যে চিঠি লেখার জন্য ঠিক এই সময়টাকেই বেছে নিত না। প্রতিহিংসা কোন মানুষকে কীভাবে এতটা নীচে নামাতে পারে, তা ভাবতে পারছিল না আকাশ। সীমার সঙ্গে নীলাঞ্জনের সম্পর্ক যদি গভীরই ছিল, তবে তা পরিণতির দিকে এগোল না কেন? এর কারণ কি শুধুই কোন এক চাকুরীওয়ালা বর পাওয়ার লোভ? নীলাঞ্জন কী বেকার, নাকি ধনী বাড়ির বখাটে ছেলে? নাকি কলেজি প্রেম ব্যপারটাই এতো ঠুনকো? অথবা এমনতো হতে পারে যে এরকম নীচ মানুষের মানসিকতার সঠিক হদিস পেয়েই সীমা পিছিয়ে এসেছিল! অনেক ভেবে শেষের সম্ভাবনাটাকেই আকাশের বিশ্বাসযোগ্য মনে হ'ল। এছাড়া শরীর-মনে আকাশকে কাছে টেনে নেওয়ার আর নিঃশর্ত অধিকার দেওয়ার মাঝে সীমার মধ্যে কোন অস্বাচ্ছন্দ না থাকার অন্য কোন বিশ্লেষণ হয়না যে! সীমা হয়তো ভুল করেছে, শুধরেও তো নিয়েছে, তাহলে তাকে অপরাধী ভাবা যাবে কীভাবে? পুরো ব্যপারটা একবার সীমার কাছ থেকে জানার ইচ্ছে হ'ল তার। কিন্তু আবার মনে হ'ল সীমা যখন পুরো ব্যপারটা ভুলতে পেরেছে, ভুলে নতুনভাবে সবকিছু গড়ে তুলতে চাইছে সুন্দর করে, পবিত্র করে সে সময় এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করা মানেই তো তার চেষ্টাটাকেই ধ্বংস করে দেওয়া। তাছাড়া ক্ষতস্থানে খুঁচিয়ে চললে ঘা তো কখনও শুকনো হবে না। এর চেয়ে সংসার-সন্তান নিয়ে সুখী হওয়ার চেষ্টা করা অনেক সহজ আর কাম্য বলে মনে হ'ল তার। ঘায়ের দাগ যদিবা থেকেও যায়— ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে চললে শরীরের পুরানো ক্ষতচিহ্নের মতোই একদিন তা হয়তো প্রায় বিস্মৃতির পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। তাছাড়া, আকাশের মনে হ'ল, সারাজীবন ধরে হাজারো টুকরো টুকরো কষ্ট আর যন্ত্রনার স্মৃতি বুকে জমিয়ে রেখেই তো বেঁচে থাকতে হয় আধুনিক মানুষকে। ❐

মেঘ-বৃষ্টি-রোদ্দুর

শিবব্রত পট্টনায়েক

কাল সারারাত এক ফোঁটা ঘুম হয়নি রমার। বারবার বাথরুমে গিয়ে হাতে-পায়ে আর ঘাড়ের পেছনে জল ঝাপটা দিয়ে কিছুই লাভ হয়নি। অথচ এই রাতের অপেক্ষায় গত তিনটে বছরের প্রতিটি দিন কেটে গেছে। তখন মনে হত কোর্টের রায়টা নিজের পক্ষে এলেই বুঝি নিশ্চিন্তে ঘুমুনো যাবে। কাল বিকেলে সোমনাথকাকুর ফোনটা পাওয়ার পর একটা তৃপ্তি আর প্রাপ্তির অনুভূতিতে মনটা ভরে ছিল, অবশ্য ভীষণ ক্লান্তও লাগছিল। তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। অথচ রাতে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দেওয়ার পরই যেন দুচোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল। সারা শরীর-মনে ক্লান্তি, অথচ নির্ঘুম রাত— এক দুঃসহ অবস্থা। বারবার সমীরণদের কথা মন থেকে তাড়াতে চেষ্টা করতে গিয়ে যেন বেশি করে মনে আসছিল পুরানো ঘটনার নানান খুটিনাটি টুকরো ছবি। ঘুমোনোর নিস্ফল চেষ্টায় রাত কেটে গেল, তাই দুচোখের কোণে জমে থাকা ক্লান্তি নিয়েই দিনটা শুরু হল রমার। যান্ত্রিকভাবে বাথরুম সেরে হারুর মায়ের হাত থেকে চা নিয়ে চুমুক দিতে গিয়ে রমার মনে হল— কি যেন একটা হারিয়ে গেছে। মাথার মধ্যে এক শূন্যতা যেন চাপ-চাপ অন্ধকারের মতো ছড়িয়ে আছে। কিছুই ভালো লাগছিল না তার। সেজন্য মায়ের একমুখ হাসি নিয়ে সামনে বসাটাকেও লক্ষ্য করতে চাইছিল না মন।

— যাক বাবা, এতোদিনে মুক্তি। এবার তোর নূতন জীবন শুরু হবে, খুকু। সোমনাথদা কেমন সমীরণদের চেপে ধরেছিল দেখেছিস! ঠিক খোরপোষ আদায় করে ছাড়ল। টাকা দেওয়ার ভয়ে ওদের উকিলের কতো কাঁদুনি। টাকা দেবে না, ইয়ার্কি!

মায়ের কথাগুলো শুনতে একদম ভালো লাগছিল না রমার। আসলে কারো সঙ্গে কোনও কথা বলতেই যেন অরুচি হচ্ছিল। জীবনের লাভ-ক্ষতির হিসাব করতেও মন চাইছিল না। যতোদিন ডিভোর্স আর খোরপোষের কেস চলছিল, ততোদিন সমীরণের সঙ্গে লড়াই

করার মধ্যেই যেন একটা মেতে থাকার মতো ব্যাপার ছিল, আর এখন চাওয়া মাফিক সবকিছু পেয়েও ভালো লাগছিল না তার।

— দিদিমনি, সুলতা দিদিমনির ফোন।

সুলতার সঙ্গে ফোনে গল্প করতে ইচ্ছে করছিল না রমার। এতো উচ্ছ্বাসের উত্তরে হুঁ হাঁ করে কথার জবাব দেওয়ায় আবার সুলতা কি মনে করল কে জানে! সারাদিনই এরকম বান্ধবী-শুভানুধ্যায়ীদের কনগ্রাট্স ফোন আসতেই থাকবে— একথা ভেবে রমার বিরক্তি লাগছিল।

— মা, আমি একটু একা থাকব। কারো ফোন এলে বলে দিও আমি বাড়ি নেই।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে কিছুটা তৃপ্তি পেল রমা। চিত হয়ে বালিশে মাথা রেখে বাঁ হাতের চেটোতে চোখ ঢাকা দিতেই মনের মধ্যে আবার ভিড় করে এলো পুরানো সব কথা। সমীরণের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে ভাবতে একদমই ভালো লাগছে না, অথচ এর জন্যেই তো এতোদিনের লড়াই। মা শুধু খোরপোষের টাকার কথা ভাবছে, অথচ খোরপোষের টাকা না পেলে খাওয়া জুটবে না, এমন আর্থিক অবস্থাতো তাদের নয়। মায়ের চাকুরি এখনো সাত বছর আছে; বাবা মারা যাওয়ার পরে পাওয়া টাকাগুলোও তো সবই জমানো আছে— সেও খুব কম নয়। অথচ কেস জেতার জন্য সোমনাথকাকুর কথায় কোর্টে সমীরণদের সম্পর্কে খারাপ খারাপ কথাগুলো বলতে খুব খারাপ লাগছিল। একবার বলে দিয়ে আর পিছিয়ে আসা যায় না, সেজন্য জেরার সময়ও একই কথা বারবার বলতে হচ্ছিল। দু'জন মানুষের মানসিক দূরত্ব নাকি বিবাহ-বিচ্ছেদের যথেষ্ট কারণ নয়— সেজন্য একজনকে চরিত্রহীন অথবা অন্যজনকে অত্যাচারী না প্রমাণ করতে পারলে কেস জেতা যায় না। তখনও এই মিথ্যাচারকে মেনে নিতে মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। মা আর সোমনাথকাকুর বোঝানোতে তখন এসব বলতে রাজী হয়ে বোধহয় ভুল হয়ে গেছে। তাছাড়া শেষের দিকেতো সমীরণ বোঝাপড়া করার চেষ্টাও করেছিল। যা হল, তা ঠিক হল কি না, অথবা কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক—এসব ভাবতে গিয়ে কোনও রাস্তা না পেয়ে রমা যেন নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে উঠল।

— একা একা শুয়ে আছিস কেন? সবাই তোকে খুঁজছে। যা, কথা বল।

— মা, আমাকে একটু একা থাকতে দাও। আমার একদম ভালো লাগছে না।

— তুই তো অবাক করলি! আজ আনন্দের দিনে তোকে সবাই খুঁজছে, আর তুই শুয়ে আছিস! কি হয়েছে তোর? শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

— আঃ, শরীর খারাপ হয়নি। তুমি যাওতো।

— দেখ, শরীর খারাপ নয়, তবু তুই শুয়ে থাকবি? আমি সবাইকে বার বার এতো মিথ্যে কথা বলতে পারবো না।

— তুমি থামবে? মিথ্যে কথা না বলা নিয়ে আর বড়াই করো না তো। ক'দিন আগেইতো সবাই মিলে সাজানো মিথ্যে কথাগুলো কোর্টে বলার জন্য আমাকে বোঝাচ্ছিলে।

— তোর কি হয়েছে বলতো খুকু? আজকের দিনে এইসব কথা তুলছিস! কেসে জেতার জন্যে এরকম অনেক কিছু করতে হয়, সব সময় সত্যি কথায় কাজ হয়না। ওই কথাগুলো তুই না বললে আমরা জিততে পারতাম? আমরা তোকে তোর ভালোর জন্যেই

বোঝাচ্ছিলাম। কারো কথা শুনবি না, ঝামেলা পাকাবি, আবার তোর ভালোর জন্য কিছু করতে গেলে কথাও শোনাবি!

— তোমার কোন কথা শুনিনি মা? কি ঝামেলা পাকিয়েছি?

— দ্যাখ, এখন আর সেসব কথা বলতে চাই না। তুই-ই কথাগুলো তুললি। সমীরণকে বিয়ে করার জন্যে তুইতো পাগল হয়ে গিয়েছিলি! আমার মতের কোনো গুরুত্ব দিয়েছিলি? ওদের পুরানোপন্থী বাড়ি, ওই বাড়িতে বিয়ে হয়েই তো তোর সর্বনাশ হল।

— দ্যাখো মা, সমীরণকে বিয়ে করে আমার সর্বনাশ হয়নি। আমার যা হওয়ার তা হয়েছে তোমার জন্যে।

— আমার জন্যে! তার মানে?

— মানেটা এখন বুঝতে পারছো না, না? তুমিইতো বুদ্ধি দিয়েছলে বিয়ের পর পর বাচ্চা নিয়ে নিলে জীবনে মজা করবি কখন, সমীরণরা গেঁয়ো, ওদের জানানোর দরকার নেই, আমিই ব্যবস্থা করছি ... এইসব।

— সে তো তোর ভালোর জন্যেই।

— ভালোর জন্যে, তাই না? একবারও ভাবলে না এ ঘটনা গোপন না থাকলে কি হতে পারে?

— তুই বললি কেন?

— মা এতোদিন বলিনি, আজ বলছি, শোন। সমীরণ মনে হয় ডাক্তারদের কথায় কিছু আঁচ করেছিল। সেজন্যই বোধহয় একদিন সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি মিথ্যে বলতে পারিনি।

— বেশ করেছিস। যা চুকে বুকে গেছে, তা নিয়ে এতো ভাবার কি আছে?

— মা, সমীরণের সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার অভাব হতে শুরু হয়েছিল কিন্তু এরপর থেকেই। ওর যখন তখন রেগে যাওয়া, ঝগড়া করা — এসব কিন্তু আগে ছিল না।

— তুই কি বলতে চাস? আমিই এজন্য দায়ী?

— আমি কিছু বলছি না, মা। শুধু তুমি আমাকে একটু একা থাকতে দাও। আমার একদম ভালো লাগছে না।

— খুকু খুকু, মন খারাপ করে বসে থাকলে হবে? তোর এমন কি বয়স? আবার নূতন করে সবকিছু শুরু করার কথা ভাব। রূপ, অর্থ— কিসের অভাব তোর? তোকে পছন্দ করার ছেলেরও অভাব হবে না। শুধু শুধু সমীরণের কথা ভেবে সময় নষ্ট করছিস কেন?

— মা, তুমি কি যাবে না? কতোবার বলব আমার এসব কথা একদম ভালো লাগছে না।

মা চলে যাবার পর মায়ের বলা কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল রমার। মায়ের কথামতো যদি সত্যি সত্যি অতীতের কিছুটা মুছে দেওয়া যেতো, তাহলে বোধহয় কোনো সমস্যা থাকতো না। কিন্তু জীবনতো সাদা কাগজে পেনসিলের আঁচড় কাটা নয়, যে ইরেজারের ঘসায় উঠে যাবে! আর আঁচড়ের রং উঠে গেলেও দাগ থাকবেই। তার জীবনের এই দাগের কথাগুলোতো মা বোঝে না। ডাক্তার সান্যালের একান্তে বলা কথাগুলোর আসল মানে বোঝার পর আবার বিয়ে করার কথা ভাবাই যায় না। যে কারণে সমীরণ তার সমস্ত ভালোলাগার স্মৃতিগুলো ভুলে গিয়ে এমন অমানুষের মতো ব্যবহার করা শুরু করতে

পারে, সেই ঘটনাকে অন্য কোনও পুরুষ মানুষ সহজভাবে নেবে— তার গ্যারান্টি কোথায়? আর নিজের অক্ষমতা জানার পর কাউকে বিয়ে করা মানে তো তাকে ঠকানো। সারাজীবন একথা লুকিয়ে আর একজনের সঙ্গে ঘর করাও তো চরম যন্ত্রণার।

— দিদিমণি, জলখাবার রেখে গেলাম।

— না, তুই নিয়ে যা। আমি কিছু খাবো না।

এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করতে গিয়ে আবার আগের চিন্তাতেই ফিরে গেল রমা। কোর্টের রায়ে কেস জেতায় কি জেতা হল তা বুঝে উঠতে পারছিল না সে। অথচ এরজন্যেই সমীরণের মাকে অকারণে অত্যাচারী সাজানোর নাকি প্রয়োজন ছিল! কোনো সাতেপাঁচে না থাকা একজন মানুষকে সবার সামনে ছোট করে কিই বা পাওয়া গেল! মাঝখান থেকে সমীরণের সঙ্গে একসাথে পাওয়া আনন্দের স্মৃতিগুলোকেও এখন অনধিকার চর্চা ভেবে ভোলার চেষ্টা করতে হবে, এটাই সবার দাবি। কলেজের সাইকোলজির প্রফেসর শুভ্রকান্তবাবুর কিছু কথা হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল রমার। পুরুষ-পৌরুষ-ইগো — এসবের একের সঙ্গেঅন্যের সম্পর্কের ব্যাখ্যা যেন এতোদিন সত্যি সত্যি বোঝা গেল। আজ— এতদিন পরে রমার মনে হতে লাগল —হয়তো সমীরণেরও রাগ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। দুর্ব্যবহার হয়তো ছিল সেই রাগেরই প্রকাশ।

— দিদিমণি, তোমার ফোন, ধরে আছে।

— বললাম না, বাড়ি নেই বলে দিস্। কে ফোন করেছে?

— জামাইবাবু।

হারুর মায়ের কথায় শক্ খাওয়া মানুষের মতো রমা চমকে উঠল। হারুর মায়েদের কাছে বোধহয় ডিভোর্স-খোরপোষ—এসবের কোনো মানে নেই। সমীরণ কি বলতে চায় তা বুঝতে না পেরে টলতে টলতে রমা গিয়ে ফোন ধরল।

— হ্যালো, রমা?

— বলছি।

— শোনো, তোমার শাড়ি-জামাকাপড় আর গহণাগুলো আজ-কালের মধ্যে নিয়ে যেও। পরশু থেকে আমি থাকছি না।

— কোথায় যাবে?

— দিল্লী। যাক্ ওসব খবর জেনে কোনও লাভ নেই। তুমি নিজে এসে নিয়ে গেলে ভালো হয়। আমিতো ঠিক জানিও না কোথায় কি রাখা আছে। আর মা তো ওসব চেনেও না।

— ওসব কথা থাক। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে, আজকেই। কোথায় যাবো?

— আমার সঙ্গে কথা? ... আচ্ছা, যাইহোক, তাহলে তুমি সেন্ট্রাল পার্কের গেটে বিকেল চারটে নাগাদ পৌঁছে যেও।

— ঠিক আছে। অবশ্যই আসবে।

ফোনটা নামিয়ে রেখে রমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। ❑

উত্তরণ

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

মেয়ের ভোরবেলায় ঘুমভাঙ্গা চোখে মাকে দেখতে না পাওয়ার অভিমানের অন্যমনস্ক কৈফিয়ৎ দিতে দিতে নিজেকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করছিল পরমা। অভিজিতের কাছ থেকে রিন্টিকে কোলে নিয়ে আদর করতে গিয়েও অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সে। অভিজিতের সঙ্গে কাল রাতের বচসা, ভোর রাতে হাসপাতাল থেকে ফোন পেয়ে আসা, হঠাৎ করে পাওয়া ডায়েরীর পড়া কথাগুলো নিজের জীবনে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়ে যাওয়া আর যে মহিলাটিকে অসহ্য গায়ে পড়া বলে মনে হত, তাকেই নিজের আসল মা বলে জানা—এ সব কিছুই যেন পরমার মাথার মধ্যে এক সঙ্গে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেবেলা থেকে ছোটমাসী, মেসো আর রবিমামার ডানার আড়ালে বড় হতে গিয়ে, কিংবা অভিজিতের সঙ্গে এই কয়েক বছরের নিস্তরঙ্গ, আটপৌরে জীবনে অভ্যস্ত হতে গিয়ে ঘাত-প্রতিঘাতময় বাস্তব দিকটা তেমনভাবে অনুভব করার সুযোগ তার হয়নি। ঘটনাক্রমের আকস্মিতায় আর গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে জমে থাকা উদ্বেগে পরমা কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল, আর আস্তে আস্তে কথার বলার ইচ্ছে বা ক্ষমতাটাই তার চলে যাচ্ছিল। শারিরীকভাবে করে যাওয়া কাজগুলোর, মাসী-মেসোর বোঝানোগুলোর, এমনকি রিন্টির কথাগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না পরমার মস্তিষ্কে। নির্বাক চলচিত্রের সাদা-কালো ছবির মতো চোখের উপর দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছিল সমস্ত ঘটনা। এতপর সারাদিন হাসপাতাল-পুলিশ-শ্মশান—এই করতে করতে কখন যে গভীর রাত হয়ে গিয়েছিল বাড়ী ফিরতে, তার কিছুই টের পেল না পরমা। বাথরুমের শাওয়ারের জল গায়ে পড়তেই যেন চমক ভাঙল পরমার। আস্তে আস্তে ভাঙল তার আবেগের বাঁধও। চোখের নোনতা জল মিশে গেল স্নানের জলের সঙ্গে, আর আস্তে আস্তে বাস্তবে ফিরে আসতে লাগল পরমা। গত কয়েক মাসের সমস্ত ঘটনা যেন এক স্বপ্নের ঘোরে দেখা কিছু দৃশ্য বলে মনে হচ্ছিল তার। অথচ এই মুহূর্তে নিজের অবস্থাটি বুঝতে গিয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য নানান পরিস্থিতির কথা তার মনে হতে থাকল। সেই পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে নিজের অবস্থানটা কোথায়—এই চিন্তা করতে গিয়ে কোন আলোর দিশা খুঁজে পাচ্ছিল না পরমা। কেমন চরিত্রের মহিলা ছিলেন তার জন্মদাত্রী? কোন পাপের ফসল হিসে কি তার এই পৃথিবীর আলো দেখা? না হলে কেন নিজের সত্যি পরিচয়ে বড় হওয়ার কোন সুযোগ পাওয়া গেল না! ছেলেবেলার তিন মাস বয়সে মায়ের মৃত্যু বা তার কয়েক মাস পরে বাবার দুর্ঘটনায় মৃত্যু—এসব গল্পের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? কার পাপ ঢাকতে? ছেলেবেলা থেকে যা জেনে এসেছে, সবই মিথ্যে! কোন এক অবৈধ সম্পর্কের, এক লজ্জাকর পাপের ফসল হিসাবে নিজেকে ভাবতে গিয়ে ঘৃণায় সারা শরীর শিউরে উঠল পরমার।

বাথরুমের দরজার দুম দুম শব্দে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল পরমার। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে মাথা বের করে সে দেখল ছোটমাসীর উদ্বিগ্ন চোখ। ছোট করে 'আসছি' বলে দরজা বন্ধ করে সাওয়ার বন্ধ করল। ভেজা শরীর শুকনো করতে করতে পরমার মনে হল ছোটমাসীরা

তাকে নিয়ে কতোটাই না উদ্বিগ্ন। এই উদ্বিগ্নতা তো অভিনয় নয়, অকৃত্রিম ভালোবাসার থেকেই এর জন্ম। নিজেদের সন্তান নয় জেনেও তাকে সন্তানের পরিচয় দিয়ে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশী ভালোবাসা দিয়ে বড় করা—এ তো শুধু দুশ্চরিত্রা দিদির পাপের ফসলকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ববোধ থেকে আসতে পারে না। নিজের মা-বাবা নয় জেনেও মাম বা বাবাইকে বাবা-মায়ের থেকে অন্যকিছু ভাবার কোন সুযোগই হয়নি কোন দিন। রবিমামা, ছোটমাসী বা মেসো—এদের এত ভালোবাসা পাওয়া, আর নিজের আসল মায়ের ছেলেবেলাতেই তাকে ফেলে চলে যাওয়া—এই দুটোর তুলনা মনে এসে চোখ দুটোকে আবার ভিজিয়ে দিল। চোখমুখ মুছে ফেলে স্বাভাবিক হওয়ার চূড়ান্ত চেষ্টা করতে করতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে পরমা দেখল অভিজিত দু'হাতের তালু মুড়ে কপালে ঠেকিয়ে কনুই দিয়ে টেবিলে ভর রেখে ঝুঁকে বসে আছে চেয়ারে। ছোটমাসী এসে পিঠে হাত দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে পরমাকে বসাল চেয়ারে। মেসো ছেলেবেলা থেকে পরিচিত সেই পুরাণ ভঙ্গীতে একটু ঝুঁকে হাতদুটো পেছনে মুড়ে ব্যালকনিতে পায়চারী করেই চলেছে। পরমার মনে হল কোন এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মধ্যে যেন সবাই ঘোরাফেরা করছে, আর সেই দুঃস্বপ্নের সবটাই তাকে ঘিরে। রিন্টিকে বোধহয় ছোটমাসী খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। ছোটমাসীর চাপাচাপিতেও এক গ্লাস জল ছাড়া অন্য কিছুই খেতে পারল না পরমা। তারপর ঘরের মধ্যে শুধু নির্বাক কিছু মুহূর্ত। অবশেষে অস্বস্তিকর সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গল মেসোর কথায়।

—রমা, কিছু কথা তোকে আমাদের বলার আছে। কাল রাতেই বললে হয়তো ভালো হত, তবে ব্যাপারটা কিভাবে নিবি ভেবে বলতে পারিনি। এখন তো আর না বললেই নয়। তোর মা তোর ছেলেবেলায় মারা যায়নি। তবে...

মেসোর কথার মধ্যে বাধা দিল ছোটমাসী।

—কি সব বলছ এখন? এসব কথা সহ্য করার মতো অবস্থাতে ও আছে কি? এত তাড়াহুড়োর কি আছে। পরে সব জানলেই হবে।

পরমার কিছু শুনতে ইচ্ছে করছিল না। তাছাড়া লাল ভেলভেটে মোড়া ডায়েরীটার কথা তো ছোটমাসীরা জানে না। কারোর কাছ থেকে আর কিছুই জানার ইচ্ছে নেই পরমার। ছোটমাসীর কথায় অন্যমনস্কতা কেটে গেল তার।

—রাত হচ্ছে, আমরা এবার আসি রমা। কাল তো রবিবার, সকালে এসে কথা-বার্তা বলা যাবে। তোরা এখন একটু ঘুমোনোর চেষ্টা কর।

ছোটমাসীদের বেরিয়ে যাবার পর বিছানার মধ্যে কোন রকমে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল পরমা। নাইট-ল্যাম্পের হালকা সবুজ আলোয় ভরে ছিল গোটা বেডরুম। ডান হাতের তালুর পেছনটা উঠে এসেছিল দুই ভুর মাঝখানে। সারাদিনের নানান ঘটনার ভিড় সব যেন হঠাৎ করে চলে গেছে মস্তিষ্ক থেকে। একটা শুন্যতা ছাড়া আর কিছুই পড়ে নেই অনুভূতির জগতে। বন্ধ চোখের সামনে শুধু কালো রঙের কিছু বুদবুদ তৈরী হয়ে আবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। বিচিত্র জ্যামিতিক আকারের কিছু বস্তু মাঝে মাঝে চোখের সামনে জন্মে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ এভাবে অর্ধচেতন অবস্থায় থাকার পর কিছুটা সম্বিত ফিরে

এল অভিজিতের দেশলাই জ্বালানোর শব্দে। আলতোভাবে চোখ খুলে পরমা দেখল অভিজিত একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে অন্যমনস্ক হাতে সিগারেটে টোকা মেরে চলেছে। একবার কিছু বলার জন্য পরমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কোন এক অজানা অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে আবার ধোঁয়া নিতে থাকল। পরমা অনুভব করল তার, রিন্টির আর অভিজিতের এই যে সম্পর্কের বৃত্ত, আলাদা করে যেখানে কোনদিন নিজের কোন অস্তিত্বের কথা মনে হয়নি, তা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। অনিশ্চয়তার, অজানা ভয়ের একটা ছায়া যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। নিজের ভবিষ্যত, রিন্টির ভবিষ্যত অথবা নিজের হাতে সাজান এই সংসারের ভবিষ্যত — সবই যেন তালগোল পাকানো, এক অনিশ্চয়তার মোড়কে মোড়া। দু-চোখ বন্ধ করে এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পরমা অনুভব করল ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া নিজের কপালে। চোখ খুলে দেখল অভিজিত পাশে বসে আছে। পরমা ধীরে ধীরে উঠে বসল। অভিজিতের আকর্ষণে বুকে মুখ রাখতেই পরমা হারিয়ে ফেলল সমস্ত সংযম। সারাদিনের সমস্ত রুদ্ধ আবেগ বেরিয়ে এল কান্না হয়ে। এতোদিন ধরে নিজের বোঝার, নিজেকে বোঝানোর খেই খুঁজে না পাওয়ার চিন্তার জটিলতার মধ্যে খুঁজতে থাকা উদ্বেগ মুক্তির পথ, চিন্তার ভার কমানোর পথ সে পেয়ে গেল পিঠের ওপর অভিজিতের দেওয়া আলতো কয়েকটা চাপড়ানো থেকে। সমস্ত আবেগই এক সময় তীব্রতা হারায়, অভিজিতের স্যান্ডো গেঞ্জী আর বুকের লোম অনেকটাই ভিজিয়ে দেওয়ার পর পরমা কিছুটা ধাতস্থ হল।

পাশে শুয়ে আলতো হাতে পরমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে অভিজিত পরমাকে আরো খানিকটা সামলে নেওয়ার জন্য কিছুটা সময় দিল, তারপর মৃদু স্বরে বলতে শুরু করল,

—দ্যাখো রমা, মানুষের জীবনের এমন এক একটা দিন আসে, যখন তার ছেলেবেলা থেকে জানা পরিবেশ, চেনা পৃথিবী হঠাৎ করে অচেনা হয়ে যায়। মনে হয় যেন আকাশ ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর। সে সময় মানুষের চেতনা, বোধ, বুদ্ধি— সবকিছুই ওলট-পালট হয়ে যায়। আজ আমাদের জীবনের সেই রকম একটা দিন। তোমার মায়ের পরিচয় আর মৃত্যু নড়িয়ে দিয়ে গেছে তোমার জীবনের ভিত, আর আমার জীবনের উপলব্ধির ভিতটাও আজ নড়ে গেছে। তবু বলছি, স্থির হও, এতো উতলা হওয়ার মতো কিছুই ঘটেনি।

—উতলা হওয়ার মতো কিছুই ঘটেনি?

—না ঘটেনি। আসলে তুমি ঘটনাগুলোকে কিভাবে বিচার বা বিশ্লেষণ করবে তার ওপর সবকিছুই নির্ভর করে। আমরা অধিকাংশ সময় কোনকিছুর বিচার করতে গিয়ে তার সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা তৈরী করে নিয়ে পরে বিচার করতে বসি।* [redacted] বাকী সবকিছুকেই তোমার মূল্যহীন মনে হবে, নিজেকে মনে হবে অস্পৃশ্য কোন জীব। মাকে পাপী মনে করলে তোমার মনে জমে থাকা ঘৃণা পাপী মায়ের স্মৃতি হয়ে ছায়ার মতো তোমাকেই সারাটা জীবন অনুসরণ করে চলবে।

—কিন্তু রিন্টি! ও যখন আমার পরিচয় জানবে, আমাকে ঘৃণা করবে, নিজেকে অপবিত্র মায়ের সন্তান মনে ~~করে বাঁচব?~~ করবে, তখন আমি কেমন করে বাঁচব?

—দেখো রমা, মা, বাবা, সন্তান আর সমাজ—এই ব্যাপারগুলোকে একসঙ্গে গুলিয়ে

* সেজন্য বিচার নির্ভুল হয় না, তুমি যদি মায়ের জীবনের একটি ঘটনাকেই শুধু বিচার করতে বস, মাকে দোষী মনে করে তাঁর জীবনের

ফেলো না। সব সন্তানই তার মা-বাবার কামজ সন্তান। সমাজ কাউকে বৈধ, কাউকে অবৈধ ঘোষণা করলেই কোন সন্তানের জন্ম রহস্য তাতে কিছুমাত্র বদলায় না। তাই নিজের জন্মের জন্যে তো কেউ দায়ী হতে পারে না। রিন্টির জন্মানোটা যদি কোন ঘৃণ্য ব্যাপার না হয়, তাহলে তোমার জন্মানোটা ঘৃণ্য হবে কেন?

—কিন্তু অতীত তো কোনদিন পিছু ছাড়ে না।

—না ছাড়ুক, তবু অতীত অতীতই। অতীতের যন্ত্রণাকে ঘাটাঘাটি করেই বা লাভ কি রমা? এতে তো বর্তমানটাই কেবলমাত্র বিষিয়ে যায়, এ ছাড়া কিছুই হয় না। আর তোমার অতীত খুব খারাপ কিছু বলেই বা মনে করছ কেন?

—কিন্তু আমি যে ভুলতে পারি না ঐ মহিলার, মানে আমার মায়ের কথা। জন্ম দেওয়ার পর কি আমার প্রতি কোন দায়িত্ব ছিল না ওনার? তারপর কোন এক সরোজের মা বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা, এটাকেও কি তুমি স্বাভাবিক বলবে?

—তোমার মা আমার বন্ধু সরোজের মায়ের সহকর্মী ছিলেন এক সময়। সেজন্যই বোধ হয় সরোজের জীবনটাকে নিজের সন্তানের জীবন বলে অন্যদের সহজে বোঝাতে পেরেছিলেন। কিন্তু এছাড়া ওনার কিই বা আর করার ছিল বলতে পারো? পরিচয়হীনা হলে এই হতভাগা দেশে একজন বয়স্কা মহিলার বৃদ্ধাশ্রমেও ঠাই জোটে না। আর তোমার প্রতি কর্তব্য? তুমি ওনাকে সোনাগাছির মেয়েদের স্বনির্ভর করার জন্য গান শেখাতে দেখেছো। এছাড়াও ঐসব মেয়েদের বাচ্চাদের সুস্থ পরিবেশে রেখে শিক্ষিত করার জন্য একটা সংগঠন গড়ে তুলছেন উনি, আর হয়ে উঠেছেন তাদের 'বড়দি'। এতো মহৎ মনের মানুষ নিজের সন্তানের প্রতি দায়িত্বটুকু অস্বীকার করবেন বলে তোমার মনে হয়? এই যে তুমি পরমা, সুশিক্ষিতা, গৃহিণী, মা—তোমার জীবনের এই স্বাভাবিক পরিণতি পাওয়ার কোন সুযোগ কি আমাদের সমাজ কোন কুমারী মায়ের সন্তানকে দেয়? তুমিও তো মা, বোঝ না নাড়ির টান কি জিনিস। তোমার প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য উনি সেই টানটাকেও অস্বীকার করার চেষ্টা করে গিয়েছেন সারাজীবন।

—কিন্তু এতোটা বয়স পর্যন্ত তো ওনাকে আমি কোনদিন দেখতে পাইনি।

—রমা, এতোটা বয়স পর্য্যন্ত তোমার কাছে ওনার কোন অস্তিত্ব থাকলেই কি তা ভালো হোত? কোন্ পরিচয়ে উনি তোমার কাছে আসতেন? মানুষ চিনতে আমরা সবাই প্রায়ই ভুল করি, তাই ঠকে যাই। পরে তা হয়ে যায় আমাদের অভিজ্ঞতার অঙ্গ। অথচ একইরকম একটা ভুলের মাশুল একজন মহিলাকে গুণে যেতে হয় সারা জীবন। মৃত্যুর পরেও সে মাশুল গোণা শেষ হয়ে যেতে চায় না।

—উনিতো আমার সামনে না এলেও পারতেন।

—হয়তো পারতেন, তবে শেষ বয়েসে পৌঁছে নিজের মেয়ে আর নাতনিকে দেখে বোধ হয় সামলাতে পারেন নি। হয়তো বা পৃথিবী থেকে চলে যাবার আগে সত্যটা তোমাকে জানাতে চেয়ে ছিলেন, আর সেজন্যই বোধহয় ডায়েরী লেখা শুরু করেছিলেন। আর তুমিও তো তখন বুঝতে পারতে না কেন এক অজানা-অচেনা মহিলাকে দেখে তোমার এতো অস্বস্তি

* তুমি তখন ওনাকে নিজের মা বলে গ্রহণ করতে না, কিন্তু তুমি তো ..

হত। নিজের মনের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে থাকা কথাটা তোমার কাছে স্পষ্ট হয়নি কোনদিন। আসলে ঐ মহিলার কম বয়সের মুখটিকে তুমি প্রতিদিন কতোবার দেখেছ আয়নায়, পরিচর্যা করেছ। আজ ওনার শেষযাত্রার সময় হঠাৎ করে আমার চোখে তা ধরা পড়ল।

—কিন্তু অভিজিত, তুমি যাকে ভুল বলছ তা পাপ নয় কেন?

—রমা, ভুল ভুলই। ভুল আমরা কে করি না বলতো? ইচ্ছাকৃতভাবে বার বার একই অন্যায় কাজ করলে তাকে তুমি পাপ বলতে পারো, কিন্তু ভুল মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকে যাওয়াটা কোন পাপ নয়। প্রথমে তোমার মায়ের কথা জেনে আমিও বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। হয়তো যে পরিস্থিতিতে যেভাবে কথাগুলো শুনেছিলাম, তারও একটা প্রভাব ছিল। গতকাল একটু বেশী ড্রিঙ্ক করাও হয়ে গিয়েছিল। তবু আমি কাল রাতে তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি, তাতে নিজেই নিজের কাছে অনেক ছোট হয়ে গেছি। নিজেকে ঘেন্না লাগছে। তুমি রাতের পর রাত ঘুমোতে না পেরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থেকেছ, কি যন্ত্রণার মধ্যেই না এতোগুলো দিন কাটিয়েছ, আর আমি বিরক্ত হয়েছি। দিনের পর দিন তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। দ্যাখো, মানুষের পরিচয় তো তার কোন একটা ভুলের মধ্যে নয়, তার পরিচয় মনুষ্যত্বে। ভাব তো পরিচিত সবাইয়ের থেকে দূরে চলে গিয়ে, সন্তানকে ভুলে থাকার চেষ্টা করতে করতে কিরকম যন্ত্রণার মধ্যে ওনার দিন কাটত। সমস্ত নীচতা থেকে দূরে থেকে নিজেকে প্রতিদিন ছাপিয়ে যেতে যেতে [redacted] আমাদের মতো সাধারণ মানুষের থেকে অনেক ওপরের স্তরের একজন মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা, এটা কম কথা নয়। জানি না উনি কোথা থেকে পেলেন এতো আত্মবিশ্বাস, তবে এই মায়ের মেয়ে হিসাবে তোমার গর্বিত হওয়া উচিৎ রমা। এইসব ফালতু কৌতুহলগুলোকে ঝেড়ে ফেলো, নিজের মনকে বোঝাও কার জীবনে কি কি ভুল বা মিথ্যে ছিল—এসব খোঁজ করার মতো নীচ মনের মানুষ তুমি নও।

—কিন্তু তোমার কাছে তো সারাজীবনের জন্য আমি ছোট হয়ে গেলাম।

—কেন ছোট হবে রমা, আর এরকমটা মনে করবেই বা কেন? তোমার মায়ের কথা ভেবে জীবনের এই সব প্রতিষ্ঠা, যা এতদিন ধরে অর্জন করেছি, সবই তুচ্ছ লাগে। একজন মানুষ কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠা না পেয়েও কতোকিছু করে যেতে পারেন! ভালো ক্যারিয়ার তৈরী করার দৌড়ে থেকে আমার ঘাড়ে চেপেছে আত্মবিশ্নের ভূত। আর তার যমজ ভাই টেনশন জীবনটাকে করে তুলছে যন্ত্র। এভাবেই হয়ত সারা জীবন কেটে যেত, যদি না তোমার মায়ের মৃত্যু আমাকে নাড়া দিত। এতো ছুটোছুটি করে কি হতে পেরেছি? করাপশনে ভরা একটা সিস্টেমের নাট বা বল্টু। নিজের কথা ছাড়া অন্য কারোর কথা জীবনের কোনদিন ভাবিনি। রমা, সত্যি সত্যি কোনটা যে পাওয়া, কোনটা হারানো, বোঝা মুশকিল। তুমি নিজের মাকে পেলে আজ তাঁকে হারিয়ে, আর আমার প্রাপ্তিও কিছু কম নয়। দুঃখ করো না, আজ আমাদের আনন্দের দিন।

পরমা ভাবল মায়ের ডায়েরীর না পড়া পাতাগুলো অজানাই থাক। কাল সকালেই ওটা সে পুড়িয়ে ফেলবে।

কবিতা

গণ-তান্ত্রিক

নিবারণ চক্রবর্তী

আমরা সবাই গণতন্ত্রের ভক্ত
তারই প্রয়োজনে ঘাঁটি ভাইয়ের রক্ত
ঘটি-বাটি চোর, পকেটমার আর আধপাগলারা
গণ-পিটুনিতে বুঝে যায়
আমাদের হাত-মন কত শক্ত।
মেনে নিই ভোটের গণতান্ত্রিক ছাপাছাপি
আর নেতাদের গণতান্ত্রিক লুটপাট
এবং নিজের দলের গণতান্ত্রিক গুন্ডামী।

আমরা চোখে চেটে খাই পরকীয়-খুন-ধর্ষণের খবর,
(ছবি-টবি থাকলে বিষয়টা জমে জবর)
গণতান্ত্রিক সমিতির সভ্য হয়ে
গণতান্ত্রিক ফাঁকিবাজির অঙ্গ হয়ে
সবাই হতে চায় সেরা সমালোচক।

নিজের স্বার্থে বদলাই মানদণ্ড।
অন্যের ঘুষ, আমারটা উপঢৌকন,
আমারটা কাজ, আর সবই ধান্দাবাজী,
আমায় টপকে গেলেই তা নীচে নামা,
সবাই ভণ্ড, আমি আদর্শবাদী,
আসলটা কেউ বোঝে না আমি ছাড়া।
এই ভাবে থাকি কুঁয়োর মধ্যে পড়ে,
সচেতন হই স্বার্থের তরে শুধু
এই চেতনায় চলছে রথের চাকা
আমরা সবাই গণতন্ত্রের ভক্ত।

দুটি রাজনৈতিক কবিতা

শ্রী হরিপদ দাস

(১)

শ্লোগান।

'লড়াই লড়াই লড়াই চাই'
(তাই নাকি ভাই?)
'লড়াই করে বাঁচতে চাই'
(বাঁচা কি যায় বিনা লড়াই!)
'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই'
(তাই! যুদ্ধহীন লড়াই চাই!
অর্থাৎ চলুক স্থিতাবস্থাই।)
'কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও'
(কার কালো হাত? চোরা কারবারী,
চোর-নেতা না ডাকাত-মন্ত্রীর?
অথবা বিরোধী সব ষড়যন্ত্রীর?)
ইলেকসনের চাঁদার তবে
কি হয় বিধান?
কর অবধান

ভড়ং অনেক আছে জানি।
দুর্নীতি-রোধী সব ভড়ং জেনে
প্রতিদিন হচ্ছি জ্ঞানী।
'আমরা মানুষের জন্য লড়ছি
উঁচু-নীচু ভেদাভেদ মুছছি।'
(বিদেশে ব্যাঙ্কে টাকা জমাচ্ছি।)
বিরোধী-মুক্ত করতে চালাও কামান'
(ঠিক, মৃত্যুতে তো সবাই সমান!)

(দুই)

অ্যান্টিসোশালপ্রোডাকশন সেন্টার

নোংরা কাদা-ময়লার মধ্যে ঘুপচি সব বাসা,
খাওয়া-পায়খানা পাশাপাশি
এখানেই থাকে মর্তের সেরা জীব!
পেট আর তলপেটের ক্ষিদে এখানে একমাত্র অনুভূতি,
খাবার না জুটুক, রক্ত না থাক শরীরে
জেগে ওঠা শরীর প্রতিবছর পয়দা করে।
জেগে ওঠে আর পয়দা করে চরে খেতে ছেড়ে দেয়।
কাদায় কিল বিল করা জীবেদের বাঁচার ইচ্ছে হলে
রাজ-কারবারীদের ছিপে ওঠে।
ধর্মের নামে, ইজমের নামে নেচে চলে সংগ্রামী সব পুতুল।
বাঁচলে শের, মরলে শহীদ
একসুরে বাঁধা মস্তিষ্কহীন কিছু অস্তিত্ব!

আ মরি!

নিবারণ চক্রবর্তী

আ মরি বাংলু খাসা।
মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলু খাসা।
কি যাদু বাংলু টানে
টেনে দাঁড় মাঝি টানে
টেনে ভোট গায় পাবলিক
টেনে চাষ করবে চাষা।
মোদের এ বাংলু খাসা।
চিটে গুড় গুলিয়ে জলে
বাখর বড়ি মিশিয়ে ফেলে
কয়দিন রাখলে পরে
গেঁজিয়ে ফেনায় যায় ভরে।
তারপরে তা গরম করে
বাষ্পটাকে ঠান্ডা করে
পলিথিন প্যাকেটে ভরে
চালান দাও গ্রাম-গ্রামান্তরে।
মদের গরব মদের নেশা
আ মরি বাংলু খাঁসা।
এ নেশা করে মহাজনে
সুনীল-শক্তি সবাই মানে
বুদ্ধ জ্ঞানী গুহ্য জ্ঞানে
তরল সেবায় কাঁদা হাসা।
আ মরি বাংলু খাসা।
তাই মোড়ে মোড়ে দোকান বসাও,
আর সব ব্যাটাকে টেনে নিয়ে যাও।
শুধু বুদ্ধিগুলো বন্ধক নাও,
আর ঘোড়ায়-মেড়ায় দেশ ভরাও।
শুধু ট্যাক্সটা দিয়ে দাও
আর ভোট বাক্সটা ভরিয়ে যাও
'হে সেনা দল ....'।

□

বয়স

—ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

দিন যায়
        আশায় আশায়।
এটা পাব ওটা পাব
        অন্যদের টপকে যাব।
বড় হব বড় হব,
        ওঁর মতো হব
তাঁর মতো হব।
উনি তিনি গুলো বদলে যান
চলতেই থাকে অভিযান।
বাচ্চা বুড়ো এক দৌড়ে
        পড়ি কি মরি ধর তেড়ে।
'আরো'র দৌড়ে আকাশ-সীমায়
        পৌছতেই হবে ছলে বলে।
কেউ বড় হয়, কেউ বুড়ো হয়,
        বয়স কিন্তু বেড়েই চলে।

□

দাম্পত্যের দিনলিপি

—ডাঃ *শিবব্রত পট্টনায়েক*

শুরুতেই শেষ হতে চায় ভালোবাসার খেলা,
প্রতিদিন বেড়েই চলে দোষারোপের পালা।
এ পালায় আমরা চতুর, দৌড় তার তাই বহুদূর।

টেক্কা-টেক্কা, টরে-টক্কা.........
কেন? কেন? বেশ করেছি।
তোমার বেশি দোষ ধরেছি।
তুমি নির্লজ্জ। (তাই তুলি লজ্জা!)
খসে যায় সভ্যতার সজ্জা।
মেজাজই চালায়, মরেছে মন,
না পাওয়ার হিসাব চলে সারাক্ষণ।
দিন যায় হতাশায়
কিন্তু হায়!
ধেয়ে আসছে সেই সময়
যখন সবই হয়ে যাবে ফক্কা।

অন্যান্য

রমাপতি স্যার : নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান

ড. শিবব্রত পট্টনায়ক, ১৯৮৫



সালটা ছিল ১৯৮৩। মাধ্যমিক পাশ করার পর উচ্চ- মাধ্যমিকে পড়ার জন্য ভর্তি হতে গেলাম চংরাচক জগদীশ স্মৃতি বিদ্যাপীঠে। চংরাচক স্কুল সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। বাবা বলেছিলেন— রমাপতিবাবুর স্কুলে আমাকে পড়তে হবে। হোস্টেলে থাকতে হবে।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার দিন প্রথমবার দেখলাম হেড স্যারকে। কথা শুনে বুঝলাম বাবার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল স্যারের, আমাকে ভর্তি করাটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত।

আমি মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছিলাম রামচন্দ্রপুর হাইস্কুল থেকে। আমার বাবা ঐ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমার বাড়ী ছিল রামচন্দ্রপুর গ্রামেই। চংরাচক হাইস্কুল থেকে খুব বেশি দূর নয়। হেঁটে ঘন্টাখানেক বা তার একটু বেশি সময় লাগত ছুটির দিনে বাড়ী যেতে।

আমরা ছিলাম স্যারের শেষের দিকের ছাত্র, সেজন্য স্যারকে খুব বেশি পাইনি। সে সময় অনেক শিক্ষক মশাইরা হোস্টেলে থাকতেন, সোমবার থেকে শুক্রবার, যেমন সতীশবাবু, অনিলবাবু, ব্রজবাবু হস্টেলে থাকার কারণে ঘনিষ্ঠতা রমাপতি স্যারের থেকে পাইনি পাওয়া সম্ভবও ছিল না। স্যার কিছুটা রাসভারী ধরণের ছিলেন।

শিক্ষক রমাপতিবাবুর খুব বেশী স্মৃতি আজ আর মনে আসে না, তবে প্রশাসক রমাপতিবাবুর বেশ কিছু স্মৃতি আজও বেশ উজ্জ্বল। দেখতাম—উনি সমস্ত সহকর্মীদের (শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের) কেমন শ্রদ্ধা পেতেন। আর কে না জানে—শ্রদ্ধা জিনিসটা যিনি দাবী করেন, তিনি কোনদিন পান না। যিনি শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন, তিনিই কেবলমাত্র তা পান।

...ক্লাস চলছে বাইরে মচ্ মচ্ জুতোর শব্দ। শিক্ষক-ছাত্র সবাই বুঝতে পারছে কার পায়ের শব্দ আর কেন তা পাওয়া যাচ্ছে...

আজকের দিনে, ২০২৪ সালে দাঁড়িয়ে জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে আসার পরও ঠিক-ঠাক বুঝতে পারি না—শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক কবে কিভাবে হারিয়ে গেল!

বয়সের প্রভাব কিনা জানি না—পুরানো দিনের কথা প্রায়ই মনে হয়। সেই নস্টালজিয়ার মধ্যে চংরাচক জগদীশ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের অনেক স্মৃতি মিশে আছে। তবে আমাদের প্রিয় শিক্ষক রমাপতিবাবুর মতো মানুষ গড়ার জীবিকাকে আদর্শ করে নিয়ে তার সাথে একাত্ম হয়ে যেতে যেতে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার মতো মানুষ আর কোনদিন পাওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করতেও আর মনে ভরসা পাই না।

❖❖

আসুন আত্মহত্যা করা থেকে আত্মরক্ষা করি

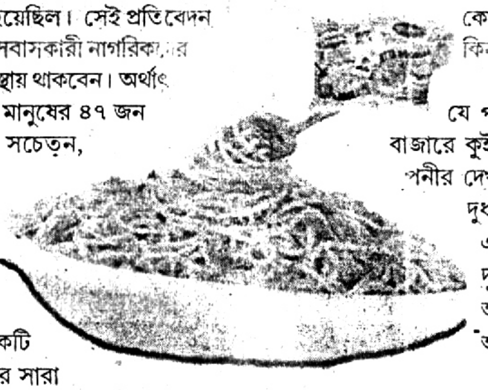
ডা. শিবব্রত পট্টনায়েক

আমরা প্রতিদিন একটু একটু করে নিজেকে হত্যা করছি, নিজের ঘনিষ্ঠজনকে হত্যা করছি। নিজেদের ভুলে, নিজেদের অজান্তে এই আত্মহত্যা ও হত্যালীলা চলছে প্রতিদিন। মাঝে-মধ্যে মিডিয়াগুলো এই নিয়ে কিছু 'খবর' করলে একটু হইচই করি, তারপর যথারীতি সব ভুলে গিয়ে প্রতিদিন একটু একটু করে সন্তান হত্যা, স্ত্রী হত্যা, বন্ধু হত্যা আর আত্মহত্যা করার পথে এগিয়ে চলি। আসুন, এই বিষয় নিয়ে একটু অন্যরকম ভাবার চেষ্টা করি।

বছরখানেক আগে B.B.C. News (শিক্ষিত মানুষকে এর পরিচয় দিতে হবে কি?) একটি খবর ছেপেছিল। তাতে ওদের দেশের ম্যাকমিলান ক্যানসার সাপোর্ট নামের একটি সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই প্রতিবেদন অনুসারে ২০২০ সালে ইংল্যান্ডে বসবাসকারী নাগরিকদের ৪৭ শতাংশ ক্যানসার আক্রান্ত অবস্থায় থাকবেন। অর্থাৎ ইংলন্ডের প্রতি ১০০ জন জীবিত মানুষের ৪৭ জন হবেন ক্যানসার রোগী! স্বাস্থ্য সচেতন, ভেজালহীন খাবার খেতে অভ্যস্ত, অতি 'উন্নত' জীবন-যাপনে অভ্যস্ত বৃটিশ নাগরিকদের হবে এই অবস্থা!

এতো গেল ভবিষ্যতের খবর। ২০০০ সালের পুরানো আর একটি রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে ঐ বছর সারা পৃথিবীর মৃত মানুষের ১২ শতাংশ ছিল ক্যানসার রোগী। এবার আমাদের দেশের গবেষণা রিপোর্টগুলোর দিকে তাকানো যাক। আমাদের দেশের National Commission on Macroeconomics and Health (N C M H) তাদের ২০০৫ সালের রিপোর্টে জানাচ্ছে যে ঐ বছরপ্রতি এক লক্ষ ভারতবাসীর মধ্যে জরায়ু ক্যানসার, স্তন ক্যানসার এবং মুখের ক্যানসার রোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে গড়ে ২১.৩০, ১৭.১০ এবং ১১.৮০ জন। এর বাইরে আছে অন্যান্য নানান ধরনের ক্যানসারের হিসাব।

NCMH রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশের মানুষের ৭০-৯০ শতাংশ ক্যানসারই পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে Lifestyle অর্থাৎ জীবন-যাপন। খাদ্য ও যৌনজীবনের প্রভাবই এক্ষেত্রে প্রায় ৩০ শতাংশ এর বাইরে আছে জীবনযাপনের অন্যান্য দিকগুলি। অর্থাৎ শুধুমাত্র সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও জীবন-যাপনের আওতায় নিজেকে ও নিজের পরিবারকে রাখতে পারলে ক্যানসার রোগী হওয়ার হাত থেকে অনেকটাই



আরো নতুন কিছু কেমিকেল মেশানো হয় কৃত্রিম রং আর কৃত্রিম গন্ধ আনার জন্য। এর উপর আছে প্রতিটি স্তরে মেশানো নানান ধরনের ভেজাল, যারকোন সীমা-পরিসীমা নেই। এরপর সুন্দর (বিষাক্ত) প্লাসটিক প্যাকেট বা কৌটাতে ভরে বহু বিজ্ঞাপিত প্রোডাক্টটি দোকানে সাজানো থাকে আমাদের জন্য। উদাহরণ হিসাবে টম্যাটো চাষ থেকে বোতলবন্দী টম্যাটো-সস্ তৈরীর ব্যাপারটি একটু ভাবলেই বিষয়টি খানিকটা পরিস্কার হবে। অবশ্য ১৫ টাকা লিটারদরে বিক্রী হওয়া এবং আমাদের রাজ্যের প্রায় সমস্ত সস্তা হোটেল-রেস্টুরেন্টে ব্যবহৃত হওয়া 'টম্যাটো সস' নামের কেমিক্যাল মিক্সচারের কথা বলছি না, কারণ এর মধ্যে আদৌ টমটো বলে কোন সবজির কোন অংশ আছে কিনা সন্দেহ।

এবার দুধের খবরাখবর। এতো যে প্যাকেটবন্দী দুধ-দই বা খোলা বাজারে কুইন্টাল-কুইন্টাল ছানা, টন-টন পনীর দেখতে পাওয়া যায়—এসবইতো দুধ থেকে তৈরি হওয়ার কথা। এতো দুধ তৈরি করে কে? এতো দুগ্ধবতী গাই আমাদের দেশে আছে কোথায়—এই প্রশ্ন কি আমাদের মনে আসে?

একথা ঠিক যে কিছু মিল্ক পাউডার (গুঁড়ো দুধ) অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড থেকে আমাদের দেশে আমদানী করা হয়। কিন্তু সেটা কতোটা? আমাদের দেশে তৈরি দুধের মধ্যে মেশানো ইউরিয়া বা ফর্মালডিহাইডের মতো মারাত্মক বিষ গুলোকে বাদ দিয়েও বর্তমানে 'তৈরি করা' দুধ, অর্থাৎ কাপড়কাচার ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে তৈরী করা দুধ, আর এইসব দুধ থেকে তৈরী করা পনীর, ছানা বা ছানার মিষ্টি খেয়ে চললে কি কি হতে পারে? কি কি হতে পারে না?

এতো গেল দুধ-দই-ছানা-পনীরের গল্প। এবার ঠান্ডা পানীয়ের বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ঠান্ডা পানীয় গুলির সাথে মেশানো অতিরিক্ত চিনি, পানীয়ের জলে থাকা পোকামারা বিষ, অন্যান্য নানান জানা-অজানা কেমিকেল যা থাকার তাতো আছেই। এছাড়াও ঠান্ডা পানীয়কে 0° C তাপমাত্রার নীচেও তরল রাখার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মেশানো হয় Ethylene glycol নামের একটি কেমিকেল। Ethylene glycol in cold drinks ইন্টারনেটে একটু search করলে অনেক কিছুই জানতে পারবেন। এই কেমিকেল থেকে

জীবন-যাপনের আওতায় নিজেকে ও নিজের পরিবারকে রাখতে পারলে ক্যানসার রোগী হওয়ার হাত থেকে অনেকটাই দুরে থাকা যায়। এটি গবেষণায় প্রমানিত।

এতোক্ষণ নানান পরিসংখ্যানের বিষয় আলোচিত হল। এসব পরিসংখ্যান আর হিসাবের বাইরে আরো অনেক কিছু আমার-আপনার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে, আর ক্যানসার ছাড়াও খাদ্য এবং জীবন যাপন সূত্রে আমরা কিডনি ফেলিওর, ফ্যাটি লিভার থেকে লিভার সিরোসিস, ডায়াবেটিস, হার্ট অ্যাটাক, সেরিব্রাল অ্যাটাক, মারাত্মক সব চামড়ার রোগ, জনডিস, টাইফয়েড সহ মারাত্মক সব পেটের ব্যামো—এসব অর্জন করি। এবার এগুলি নিয়ে একটু ভাবা যাক।

আমাদের দেশে পাঞ্জাব রাজ্যটি কৃষির জন্য বিখ্যাত। বহুল প্রচারিত 'সবুজ বিপ্লব'-এরঅন্যতম পীঠস্থান হল এই রাজ্যটি। পাঞ্জাবের ভাতিন্ডা জেলা ছিল কৃষির জন্য বিখ্যাত। দীর্ঘদিন ধরে কৃষিতে মাত্রাতিরিক্ত পোকামারা বিষ ব্যবহার করার কারনে ওখানকার মাটিরতলার পানীয় জলে এবং খাদ্য-শৃঙ্খলে সেই বিষ মারাত্মক মাত্রায় পৌঁছে গেছে। এর ফল ফলেছে একদম হাতে-নাতে। সস্তায় ক্যানসার রোগের চিকিৎসার জন্য এই জেলা থেকে এতো ক্যানসার রোগী প্রতিদিন রাজস্থান যান যে একটি ট্রেনের চলতি নামই হয়ে গেছে 'ক্যানসার এক্সপ্রেস'।

চাষ করার জন্য মাটির তলার জল ব্যবহার করার কারণে পানীয় জলের সাথে আর্সেনিক বিষ মিশে গিয়েছে অনেক জায়গায়। সেই আর্সেনিক বিষ মেশানো পানীয় জল পান করার ফলে হাতে-পায়ে-গায়ে কালো দাগ হওয়া থেকে শুরু হয়ে ক্যানসার হয়ে হাত-পা খসে পড়ার প্রতিবেদন এই পত্রিকাতেই আগে বিশদে প্রকাশিত হয়েছে।

তাহলে খাদ্যের মাধ্যমে পোকামারা বিষ আর পানীয় জলের মাধ্যমে আর্সেনিক আমরা খাই। এই তো গল্প।

না—গল্প অনেক বড়।

যেকোন শাক-শব্জী বাজারজাত করার আগে তাতে একপ্রস্থ রং লাগানো হয়। এরপর ঐসব সবজি ফল মাছ বা মাংস থেকে অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রী তৈরী করার পথে এগুলির সাথে যোগ করা হয় নানান দলের কেমিকেল—প্রিসারভেটিভ, স্টেবিলাইজার,ইমালসিফায়ার ইত্যাদি নামের। এছাড়াও ene glycol in cold drinks [illegible] করলে অনেক কিছুই জানতে পারবেন। এই কেমিকেল থেকে হয় না এমন মারাত্মক অসুখের সংখ্যা খুবই অল্প। অথচ উন্নত দেশগুলিতে এই একই উদ্দেশ্যে ঠান্ডা পানীয় গুলিতে ব্যবহার করা হয় Propylene glycol যা কিছু ফল থেকে পাওয়াযায় এবং বিষাক্ত নয়। এইসব গরীবদেশের গাধাগুলোকে অতো দামী কেমিকেল দিয়ে তৈরী ঠান্ডা পানীয় খাওয়ালে লাভ কমে যাবে!

ঠান্ডা পানীয় নামের কেমিকেল মিক্সচারগুলি না খেতে পারলে নিজের স্মার্টনেসের কোন প্রমানই দেওয়া যায় না। ক্রিকেট স্পনসর আর সিনেমা আর্টিস্টের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষের মস্তিষ্কের সমস্ত ধুসর কোষের মধ্যে এই কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। এসব বিষাক্ত বিষয় বাদ দিয়ে আরো একটি জরুরী বিষয় আছে। একটি 500 ml বোতলবন্দী ঠান্ডা পানীয় তৈরী করতে নষ্ট হয় খুব কম করে 150 লিটার (150 থেকে 300 লিটার পর্যন্ত) মাটিরতলার পানীয় জল। হ্যাঁ, 150 লিটার ঠিকই পড়েছেন। সুতরাং ঠান্ডা পানীয় উৎপাদক কোন কোম্পানী আমাদের দেশে কারখানা গড়লে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিলে উদ্বাহু নৃত্য জোড়ার আগে একটু ভাববেন—আমাদের দেশের জল-সম্পদ ধ্বংস করে দেওয়ার এটি একটি চক্রান্ত হতে পারে।

বর্তমানে একটি ফাস্ট ফুড কোম্পানীর প্রোডাক্টে মাত্রাতিরিক্ত সীসা ও আজিনামাটো (মেনোসোডিয়াম গ্লুটামেট) থাকা নিয়ে হইচই হচ্ছে। বছর দশেক আগে যেমন বোতলবন্দী পানীয় জল ও ঠান্ডা পানীয় গুলিতে মাত্রাতিরিক্ত পোকামারা বিষের উপস্থিতি নিয়ে হইচই হচ্ছিল। চিন্তা নেই, সময়ের সাথে সাথে সবই ঠান্ডা হয়ে যাবে। তবে এই সুযোগে এই ধরনের আরো কয়েকটি বিষয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

চিপস জাতীয় খাবার (পটেটো চিপস আর এই ধরনের হাওয়া ভর্তি প্যাকেটে বিক্রী হওয়া শিশুলোভ্য খাদ্য গুলি) মুচমুচে করার জন্য মেশানো হয় অ্যাক্রিলামাইড (Acrylamide), এটি এক মারাত্মক ধরনের বিষ।

৪ পৃষ্ঠায়

৩ পৃষ্ঠার পর

অনেক রেস্টোরেন্টে খাবারের সাথে আলাদা করে মেশানো হয় আজিনামাটো, জায়ফল, আর নানান সুগন্ধী কেমিকেল। এগুলি না মেশালে নাকি খাদ্দের ভিড়বে না।

যে কোন প্লাসটিক/পলিথিন প্যাকেট বা কাপে কোন পানীয়, বিশেষত গরম পানীয় বা ঠান্ডা পানীয়ের মতোকোন ক্ষার ধর্মী পানীয় রাখলেই তাতে মেশে প্লাসটিক অণু আর রং-এর অণু যা খুবই বিযাক্ত।

'সোডা সপ'-এর থেকে তিন বছরের শিশু থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যখন সুন্দর ডিজাইনের প্লাসটিক গ্লাসে ভরে মনোমতো গন্ধের (কমলালেবু, আপেল, আনারস ইত্যাদি) মনোমত রং-এর (লাল, সবুজ, হলুদ, কালো, নীল ইত্যাদি) ঠাণ্ডা পানীয় মাত্র ৫ টাকা খরচ করে খান বা খাওয়ান তখন একটু ভাববেন কি যে এ সমস্ত কৃত্রিম রং এবং গন্ধ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, কোন কোনটি শরীরে মারাত্মক বিষের কাজ করেচলে ধীর গতিতে। আপনার দেওয়া এই ঠাণ্ডা পানীয় প্রিয় সন্তানের দশ বছর পরের ক্যানসার বা কিডনি ফেলিওরের আসল কারণ, তা কিন্তু আজকের আপনি তা জানেন না। আপনার এই খুন কোন গোয়েন্দা প্রমাণ করতে পারবে না।

শুধু আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত শহরবাসী নয়, মফঃস্বল শহরতো বটেই, প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও বিষ ভক্ষণে আত্মহত্যার এই বেড়াজালের বাইরে নেই। রঙ্গীন অমৃতি, জিলিপি, মালপোয়া, হলদে বোঁদে আর তার সাথে মেশানো লাল ও সবুজ বোঁদে, রং মেশানো ঘুগনী, রং-গন্ধ মেশানো গোলাপজাম ও অন্যান্য মিষ্টি, রঙিন বরফ ও প্যাকেট বন্দী পেপসি বরফ, রঙিন আইসক্রিম রঙ্গীন লজেন্স/টফি, চিনির সাথে নানান রং মেশানো নানান নামের মিষ্টি, তেলেভাজায় ব্যবহৃত 'কাটা তেল'—এসবের মাধ্যমে মারাত্মক পরিমাণ বিষ গ্রামবাংলায় বাস করা দুস্থতম মানুষটির সন্তানের শরীরের মধ্যেও ঢুকছে।

পরিশেষে, একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই।

আমার ছেলের গৃহশিক্ষক কলকাতার একটি বিখ্যাত কলেজ থেকে B.Sc. Chemistry (Hons.) 1st class করে বর্তমানে M.Sc. পড়ছে। কথায় কথায় জানলাম যে সে রাস্তাঘাটে টিফিন সারে এগরোল চাউমিন বা ফুচকা স্টলে, আর তৃষ্ণা মেটায় বোতলবন্দী ঠাণ্ডা পানীয়তে। কিছুদিন আগে ছেলেটি মারাত্মক রকমের জনডিস থেকে সেরে উঠেছে। ছেলেটিকে কিছুতেই বোঝানো গেলনা যে কলকাতার রাস্তাঘাটে খিদে পেলে দুটো কলা তো খাওয়া যায়। আর তৃষ্ণা মেটানোর জন্য কাছে জলের বোতল আর না থাকলে ১৫ টাকার ঠান্ডা পানীয়ের বদলে ১৫ টাকারএকটা ডাবতো খাওয়া যায়। ছেলেটির বক্তব্য এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়—দুটোই প্রেসটিজিয়াস। ছেলেটি খুবই ভদ্র-কোনরকম বদ খেয়ালবা নেশা নেই। অথচ টানা আধঘন্টা ধরে তাকে কিছুতেই বোঝানো গেল না যে রাস্তায় দাড়িয়ে ফুচকা বা চাউমিন খাওয়া অসম্মানের না হলে দুটো কলা খাওয়া অসম্মানের হয় না।

... এই ... প্রতীক। ... কোন

আমার ছেলের এই গৃহশিক্ষক হল এই প্রজন্মের প্রতীক। এর তো তবু কোন বদখেয়াল বা নেশা নেই, অকারণ উগ্র ব্যবহার নেই, অথচ 'মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্রে' এমন ভাবে এরও মানসিক গড়ন তৈরি যে বাড়ীর তৈরি খাবার, ফল, শাক সব্জী—এসবের বিরুদ্ধে একধরনের মানসিক প্রতিরোধ তৈরি হয়ে গেছে।

নিজেদের পৃথিবীর নিরঙ্কুশ প্রভু ভাবা চরম ভোগবাদী দেশটিতে ছেলেমেয়েরা ভোগের জন্য সবসময় লালায়িত, অধিকাংশই পড়াশোনা তেমন একটা করে, না। নিজেদের দেশের কাজ আউটসোর্সিং করে অন্যদের দিয়ে করাতে হয়। এদিকে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশের ছেলেমেয়েরা এখনও পড়াশোনা করে বুদ্ধিনির্ভর কাজ গুলিতে তাদের উপর নির্ভরও করতে হচ্ছে। সুতরাং তাদের মন-বুদ্ধি-কালচার সবকিছুতে পক্ষাঘাত আনতে হবে। এই চক্রান্তের অঙ্গ হিসাবে যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও 'উন্নত' রাষ্ট্রটিতে অতি অল্প মানুষের পক্ষে মোবাইল ফোন রাখার খরচ বহন করা সম্ভব—সেখানে তৃতীয় বিশ্বের গরীব লোকেদের অধিকাংশের হাতে মোবাইল, অনেকের আবার একাধিক এদেশের ইন্টারনেটের ফেসবুকে ফিচকেমি করার আর উলঙ্গ নৃত্য দর্শনের সমস্ত রকম দরজা সব বয়সের, সবার জন্য খুলে রাখা হয়েছে। 'মল' কালচারে নুতন প্রজন্মকে অভ্যস্ত করা হচ্ছে, আর বিজ্ঞাপনের যাদুর মাধ্যমে 'আধুনিক' জীবন-যাপনের লোভ দেখিয়ে নানান ধরনের বিষ শরীরে আর মগজে ভরিয়ে দিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মকে পঙ্গু, পরনির্ভর, প্রভুদাস বানানোর চেষ্টা চলছে। আমরাজনে, না জেনে অথবা জেনেও না জানার ভান করে সবাই মিলে আত্মহত্যা করার জন্য সেই দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ছি।

Reference :
Pattanayak S. (2014). Cancer–The ultimatum of our Chemical based civilization.
Exploratory Animal and Medical Research Vol. 4, Issue I, Page-5-7. Available at http://www.animalmedicalresearch.org

বাংলার সাপ

ডা. শিবব্রত পট্টনায়েক

আমাদের দেশে প্রতিবছর অনেক মানুষ সাপে কামড়ানোর কারণে মারা যান। সরকারি হিসাবে এই সংখ্যাটি ১৫০০ থেকে ২০০০ এর মধ্যে হলেও নানান বে-সরকারি হিসাবে আমাদের দেশে প্রতি বছর ৪৫০০০ থেকে ৫০০০০ মানুষ সাপের কামড়ে মারা যান। দুই হিসাবের এই বিশাল পার্থক্য থাকার কারণ হল অনেক সাপে কামড়ানো রুগীকেই হাসপাতালে না এনে ওঝা, গুনীন ইত্যাদির কাছে চিকিৎসা করানো।

সারা পৃথিবীতে প্রায় ২৫০০ প্রজাতির সাপের খবর আমাদের জানা। আমাদের দেশে মোটামুটি ২৩৬ প্রজাতির সাপের হদিস এখন অবধি জানা গেছে, যাদের মধ্যে ৫০টি প্রজাতি হল বিষধর। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের স্থলভাগে মোটামুটিভাবে ২৫টি প্রজাতির সাপের দেখা মেলে।

পশ্চিমবঙ্গের স্থলভাগের সাপ :

- স্থলভাগের সাপগুলিকে নির্বিষ, প্রায় নির্বিষ এবং বিষধর সাপ— এই তিনভাগে ভাগ করা যায়।
  ১. **নির্বিষ সাপ** : পুঁয়ে, হেলে, জলধোড়া, কেঁথোচিতি, বালিবোড়া, ধুলাবোড়া, দাঁড়াস বা ঢ্যামনা, অজগর বা ময়াল, ঘেসোচিতি, উদয়কাল।
  ২. **প্রায় নির্বিষ সাপ** : বেত আছড়া, লাউডগা, কালনাগিনী, মেটেলি, গাংবোড়া, বঙ্করাজ।
  ৩. **বিষধর সাপ** : কালাচ, শাঁখামুঠি, গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড়, প্রবাল সাপ, নোনাবোড়া, গেছোবোড়া।
- **সমুদ্র সাপ** : বঙ্গোপসাগরে মোটামুটি ২০ ধরণের সাপ দেখতে পাওয়া যায়, যার প্রায় সবগুলিই মারাত্মক বিষাক্ত। এরা সাধারণত মানুষকে কামড়ায় না।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :

- সাপের কোনো কান নেই, তাই এরা কিছু শুনতে পায় না। কিন্তু ফুসফুসের সাহায্যে এরা আশেপাশের জমির কম্পন খুব সুন্দরভাবে অনুভব করতে পারে।
- সাপের দৃষ্টিশক্তি খুব ভালো নয়। এরা স্থায়ী কোনকিছুকে বিপজ্জনক বলে মনে করে না। সেজন্য সাপ দেখে কেউ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে সাপ পাশ দিয়ে চলে যায়।
- অধিকাংশ প্রজাতির সাপের গন্ধ অনুভব করার ক্ষমতা খুবই ভালো। চেরা জিব দিয়ে বাতাস থেকে ধরে আনা নানান ধরণের গন্ধের কণা এরা মুখের ভেতরের উপরের দিকে থাকা জ্যাকবসন অঙ্গ নামের একটি জায়গায় নিয়ে যায়। এর সাহায্যে এরা নানারকম গন্ধ বুঝতে পারে। এভাবে এরা খাদ্যের সন্ধান পায়। নিজের প্রজাতির সাপকে খুঁজে পায়, বিপদেরও হদিশ পায়।
- সাপ হল ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী। সেজন্য সাপের গায়ে হাত দিলে ঠাণ্ডা লাগে। এরা অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরম সহ্য করতে পারে না। শীতকালে এরা জবুথবু হয়ে শুয়ে থাকে, যাকে বলা হয় সাপের শীতঘুম। অত্যধিক গরমেও এরা মারা যায়।

- স্থলবাসী সাপ সাধারণতঃ দিন অথবা রাত্রি যেকোনো একটি বেলা ঘুরে বেরিয়ে খাবার খোঁজার জন্য বেছে নেয়। আমাদের রাজ্যের সমস্ত বিষাক্ত সাপ রাত্রিবেলা ঘোরাফেরা করতে পছন্দ করে। তবে আধো অন্ধকার দিনের বেলায়ও (বর্ষাকালে বা সন্ধ্যার আগে) এদের কখনও সখনও দেখা যায়।
- সাপ মাঝে মধ্যে তাদের চামড়ার বাহিরের অংশ ছেড়ে বেরিয়ে আসে, একে সাপের খোলোস ছাড়া বলে। কমবয়সী সাপ তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাই ঘনঘন এভাবে খোলোস ছাড়ে।
- বন্ধ পরিবেশে অধিকাংশ সাপ ১০-২০ বছর বাঁচে।
- অধিকাংশ সাপ গাছে চড়তে পারে এবং প্রায় সব প্রজাতির সাপই জলে সাঁতার কাটতে পারে। কিছু কিছু জাতের সাপ আবার গাছে থাকতেই অভ্যস্ত (কালনাগিনী, বেত আছড়া প্রভৃতি)।
- সামুদ্রিক সাপের লেজের দিকের অংশ মাছের মতো, যদিও এদের কোনো ফুলকা বা কানকো নেই। এই ধরণের লেজের সাহায্যে এরা সমুদ্রের মধ্যে সাঁতার কেটে বেড়ায়।

সাপের খাবার দাবার :

- সাপ শরীরে অনেকটা চর্বি জমিয়ে রাখতে পারে, সেজন্য সাপের প্রতিদিন খাবার খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। একবার খেলে জমানো চর্বি ভাঙিয়ে এদের অনেকদিন চলে যায়।
- সাপ কোন তরল পদার্থ খেতে পারে না।
- অনেক প্রজাতির সাপ, বিশেষতঃ শাঁখামুঠি ও শঙ্খচূড় প্রধানত অন্যান্য বিষাক্ত বা নির্বিষ প্রজাতির সাপ খেয়ে বেঁচে থাকে।
- কালাচ ও চন্দ্রবোড়া নিজেদের জাতের ছোট ছোট সাপ ধরে খায়।

সাপের প্রজনন :

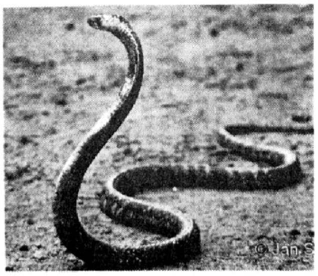
- অধিকাংশ প্রজাতির সাপ বছরে একবার বাচ্চা দেয়। অধিকাংশ সাপ ডিম পাড়ে। স্থলবাসী সাপের মধ্যে চন্দ্রবোড়া, ধুলাবোড়া ও লাউডগা বাচ্চা প্রসব করে।
- সাপ কেবলমাত্র নিজের প্রজাতির মধ্যে মিলনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে।
- পুরুষ ও স্ত্রী সাপ একে অপরকে এক ধরণের গন্ধের মাধ্যমে খুঁজে নেয়। সাপের পেটের তলায় পায়ুছিদ্রের কাছাকাছি অংশে এই গন্ধ উৎপাদক গ্রন্থি থাকে। প্রতিটি প্রজাতির সাপ স্ত্রী ও পুরুষভেদে নির্দিষ্ট গন্ধের মাধ্যমে অনেক দূর থেকে এনে অন্যের খোঁজ পেয়ে যায়।
- ডিম পাড়ার পর স্ত্রী সাপ সেই ডিমের উপর বেশ কিছুদিন বসে থেকে তা দেয়। সাপের ডিমের খোলস পাখির ডিমের মতো শক্ত নয়, কাপড়ের মতো নরম।
- ডিমের ঢাকনা ছিঁড়ে পরিণত সাপের বাচ্চা বের হয়। এদের নাকের উপর বসানো ডিম-দাঁতের মাধ্যমে এরা এই ঢাকনা ছিড়ে ফেলে। এই ডিম দাঁত পরে নষ্ট হয়ে যায়।
- বিষাক্ত সাপের সদ্যজাত বাচ্চার কামড়েও মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

সাপের বিষ :

- সাপের বিষ হল সাপের পাচক রস, আমাদের লালা বা থুথুর মতো। আমাদের লালাগ্রন্থির মতো সাপের বিষগ্রন্থি আছে। এই বিষগ্রন্থি থেকে তৈরি হওয়া বিষ একটি থলির মধ্যে জমা থাকে। বিষথলির সঙ্গে সাপের বিষদাঁতের যোগ আছে। বিষধর সাপ কামড়ানোর সময় এই বিষথলিতে চাপ পড়ে, আর বিষদাঁতের মাধ্যমে বিষ ক্ষতস্থানে পৌঁছে যায়।
- বিষাক্ত সাপ কামড়ানোর সময় গড়পড়তা যে পরিমাণ বিষ ক্ষতস্থানে ঢালে তাতে মোটামুটি ৪-৫ জন মানুষকে মেরে ফেলার মতো বিষ থাকে।
- সাপ সবসময় সমান বিষ ক্ষতস্থানে ঢালতে পারে না। অনেকসময় কোন বিষই ঢালতে পারে না। চন্দ্রবোড়া সাপ তো অর্ধেক সময়ই কোন বিষ ঢালতে পারে না।
- কোন খাদ্য খাওয়ার ঠিক পরপর কামড়ালে বা কোন কারণে বিষ ঠিকমতো ঢালতে না পারলে বিষাক্ত সাপের কাপড়েও মানুষ মারা নাও যেতে পারে।

সাপে কামড়ানোর চিকিৎসা :

- বিষাক্ত সাপে কামড়ানোর একমাত্র চিকিৎসা হল যত তাড়তাড়ি সম্ভব রোগীকে অ্যান্টিভেনাম ইনজেকশন দেওয়া। এছাড়াও ডায়ালিসিস করা, অ্যালার্জি নাশক জীবানুনাশক ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।
- মনে রাখতে হবে বিষাক্ত সাপের কামড়ানোর সময় যদি উপযুক্ত পরিমাণ বিষ ক্ষতস্থানে চলে যায়, তাহলে রোগীকে অ্যান্টিভেনাম দেওয়া ছাড়া কোনোভাবেই বাঁচানো সম্ভব নয়।
- নির্বিষ সপের কামড়ে বা বিষাক্ত সাপের বিষহীন কামড়েও রোগী ভয়ে মারা যেতে পারেন। রোগীকে সাহস যোগানো অবশ্যই দরকার।
- কোনোরকম তন্ত্র-মন্ত্র, শেকড়-বাকড়, জড়ি-বুটি, বিষ নামানো, পাথর বসানোর মতো পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে সাপের বিষের বিষক্রিয়া বন্ধ করা যায় না।
- কোমরে, গলায় বা হাতের বেঁধে রাখা শেকড়-বাকড় বা তাবিজ-মাদুলি মানুষের সাহস বাড়াতে পারে, কিন্তু সাপে কামড়ানো থেকে রক্ষা করতে পারে না।



লেখক : সহ অধিকর্তা (মাইক্রো বাইলোজি, ইন্সটিটিউট অফ অ্যানিমেল হেল্‌থ এণ্ড ভেটেরনারি বায়োলজিক্যালস্)। ফোন- ৯০৩৮৫৪৬৪৯০

গল্প

দেখা

গল্প

-- ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়ক

একটা বাচ্চা ছেলে আদুড় গায়ে রং-চটা পুরানো ঘুনসী দিয়ে জড়ানো বোতামহীন হাফ-প্যান্টটা বাঁ হাতে ধরে রেখে ডান হাত পেতে ট্রেনে ভিক্ষে চাচ্ছে। নাক দিয়ে তার পোঁটা ঝুলছে, মাঝে মাঝে সেটাকে ছেলেটি সোঁ করে টেনে নিচ্ছে। ট্রেনের কামরা ভর্তি মানুষ। কেউ পঁচিশ-পঞ্চাশ পয়সা দিচ্ছে, আর অধিকাংশ মানুষই অন্যদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করছে। অনেক আগেই পড়া শেষ হয়ে যাওয়া, মুড়ে রাখা খবরের কাগজটাকে খুলে সেদিকে তাকিয়ে আছেন কেউ বা। দু-একজন বিজ্ঞ ধরনের ব্যক্তি আবার নানান মন্তব্য করা শুরু করলেন — ''কাজ করে খেতে পারিস না?'' বা ''তোর বাবাকে পয়সা চা গে যা। জন্ম দিতে যাবার আগে তোর পেটের ব্যবস্থা করেনি কেন জিজ্ঞেস করগে যা।'' বিজ্ঞতর ব্যক্তির মন্তব্য ''এই সব হল ভবিষ্যতের অ্যান্টিসোসাল, সবে তৈরী হচ্ছে এখন। কদিন পরেই এক একটি কালসাপে পরিণত হবে।'' এরপর শুরু হয় নানান বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা - বিদেশে ভিক্ষা করা বে-আইনি, ভিক্ষে করা আজকাল একটা জীবিকা হয়ে গেছে; ফোকটে রোজগার হলে কে খাটতে চায় .... ইত্যাদি। এইসব ফুটপাথবাসী, বস্তিবাসী বে-ওয়ারিস বা প্রায়-বেওয়ারিশ শিশুদের নিয়ে ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরী করে বিদেশের ফিল্ম ফেস্টিভালে পুরস্কার পাচ্ছে কেউ কেউ। এদের দেখিয়ে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে লোন জোগাড় করছে সরকার আর আমাদের দেশের নীতিহীন রাজনীতি ব্যবসায়ীদের কাছে এরা হল ভোটব্যাঙ্কের গোছানো ধন, যা অদুর ভবিষ্যতেই কিছু মস্তিষ্কহীন ভোটার সাপ্লাই করবে। আবার এরকম শিশুদের নিয়ে পরম মমতায় খাদ্য -শিক্ষা -বাসস্থানের ব্যবস্থা করে বড় করার চেষ্টা করে চলেছে কিছু সংস্থা। কিছু সংস্থা আবার বাইরে এরকমই উদ্দেশ্য ঘোষণা করে, আর এদের বিদেশী

বাবা-মা জোটানোর নাম করে বিদেশে পাচার করে দেয়, যাতে কিডনি, লিভার ইত্যাদি অঙ্গগুলি বিদেশী ক্রেতারা স্বল্প মূল্যে পেয়ে যান। এছাড়া আমার মতো কেউ কেউ আবার এদের লেখার উপকরণ বানিয়ে নাম কামাতে নেমে পড়েন।

মফঃস্বল শহরগুলোর ভেতরের পিচরাস্তায় দুটো মোটর গাড়ী মুখোমুখি পাস করতে গিয়ে রিক্সা, সাইকেল, মোটর সাইকেল, মালবাহী ভ্যান রিক্সা ও পদচারী পথচারীর সঙ্গে মিলে গিয়ে জ্যাম তৈরী হয়ে যায় যখন-তখন। সাইকেল-মোটর সাইকেল আরোহীদের চোখে এজন্য দায়ী বড়লোকী চাল দেখানো মোটর গাড়ীর আরোহী। রিক্সা-ভ্যান রিক্সা চালকেরা এসব বিষয় নিয়ে ভাবার কিছু আছে বলেই মনে করে না, ডান-বাম যেদিক দিয়েই হোক অন্যদের টেক্কা দিয়ে আগে যাওয়ার চেষ্টায় তারা সবকিছুতেই ভ্রুক্ষেপহীন। আর মোটর গাড়ীর আরোহীর চোখে শুয়োর-কুকুরের মতো বংশবৃদ্ধি করা এইসব ছোটলোকদের জ্বালায় এদেশে বেঁচে থাকা দিনকে দিন অসম্ভবের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে!

একই ফুল বিভিন্ন দর্শনকারী চোখে বিভিন্ন রঙের চশমা লাগিয়ে দেখলে বিভিন্ন রঙের দ্যাখে। সামাজিক যে কোন 'দর্শনের' ক্ষেত্রে এই চশমাটি তৈরী হয় সংশ্লিষ্ট মানুষের রুচি, বিশ্বাস, ধারণা আর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে। শিক্ষা, আর্থিক ও সামাজিক আবস্থানও এই চশমার রং তৈরী করতে সাহায্য করে। এছাড়াও আছে একজন মানুষের চারপাশের পরিবেশের প্রভাব। সেজন্য এরকম প্রায়ই হতে দেখা যায় যে একই ঘটনা দেখে কেউ দুঃখ পায়, কেউ আনন্দ পায়, আর কেউ বা নির্লিপ্ত থাকে। যার চোখ দেখার জন্য যেমন ভাবে তৈরী, সে তেমন ভাবে দ্যাখে। সমাজকে দেখা, মানুষকে দেখা থেকে শুরু করে বিশ্বাসী মানুষ-জনের 'ঈশ্বর' কে দেখা— অর্থাৎ ধর্ম বিশ্বাস - সব বিষয় গুলিই একই চরিত্রের। সেজন্য আমার দেখাটাই ঠিক, অন্যদের ভুল — এই দাবী করার অধিকারই নেই কারোর। তবে কারোর মন সত্যি সত্যি খোলা থাকলে আর অভিজ্ঞ ব্যক্তির অর্জিত অভিজ্ঞতাকে নিজে বুঝে হজম করার ক্ষমতা থাকলে তার দেখার ক্ষমতার ধীরে ধীরে উন্নতি হয়। তবে সেরকম কোন

চেষ্টা করার পথে অনেক পরিশ্রম লাগে —তাই এরকম কোন ঝামেলায় না জড়িয়ে আমরা এক একটি কুঁয়ো খুঁজে নিয়ে তার মধ্যে বাস করি, সহবাসীদের সাথে ঝগড়া করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে ঘ্যাঁঘোর ঘ্যাঁঘোর করি, পেটের খিদে পেলে খাদ্য খুঁজে বেড়াই, আর কিছু ঝ্যাওাচির জন্ম দিয়ে পৃথিবীকে ধন্য করি। সামাজিক জীবন-যাপন করতে গিয়ে তাই নানান সুবিধা 'অর্জন' করার জন্য 'লড়াই' লড়ি। এপথে নিজেরা সুযোগ বাগানোর সময় সমস্ত নীতিবোধকে বাক্সবন্দী করে রাখি। এরপর এই কাজে বিফল হলে ধান্দাবাজীতে সফল হয়ে যাওয়া লোকজনের নীতি বোধের কটু সমালোচনায় আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিই সবসময় একটা ফাঁকা অহংবোধে ফুলে থেকে নিজেকে অন্যদের চেয়ে বেশি সৎ, আদর্শবান আর বুদ্ধিমান বলে প্রচার-চালাতে চাই। আমরা প্রত্যেকেই মনে করি, আসল ব্যাপারগুলো কেবমাত্র আমিই সঠিকভাবে বুঝি। আসলে আমাদের মতো মানুষজনের প্রত্যেকের মানসিক বাসস্থানও হল কিছু কুঁয়ো —যে গুলো হয়তো কিছুটা আলাদা আলাদা সাইজের — তবে সে গুলি কিন্তু জাতে কুঁয়োই, সমুদ্র নয়।

গল্প নিয়ে গল্প

শিবব্রত পট্টনায়েক
তৃতীয় বর্ষ, পশুচিকিৎসা বিভাগ

লিখতে চাই একটা আধুনিক গল্প, যা হবে না কারো অনুকরণ, হবে একেবারে মৌলিক। কিন্তু পুরানো দিনের ঠাকুরমার ঝুলি মার্কা বা কাল্পনিক রাজা-রাজড়াকে নিয়ে লেখা বীররসের গল্প তো বটেই, এমন কি প্রাক-রবীন্দ্রযুগের ও রবীন্দ্রযুগের প্রেমের গল্পও এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের চোখে 'প্যানপেনে।' অবশ্য স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা মানুষের হওয়ার পর থেকেই বোধহয় মানুষ নিজের সময়কালটাকে আধুনিক বলে ভেবে এসেছে। তাই ভেবেচিন্তে মনস্থ করলাম আজকের গল্প লেখকদের বেশ কিছু নামকরা গল্প পড়ে প্রত্যেকটা গল্পের গোড়ার প্লটটা তা থেকে ভেবে বের করব, আর তাহলে গল্প বানানো ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তবে এটা বোধ হয় গল্পের মধ্যেই উল্টোদিকে হেটে যাওয়া। তাই আজকের যশস্বী কয়েকজন সাহিত্যিকের বেশ কয়েকখানা কাহিনী ভিত্তিক নামকরা গল্প পড়লাম আর এভাবে বিশ্লেষণও করলাম। আজকের দিনে যে বলা হয় 'আধুনিক সাহিত্য বাস্তবচিন্তার অনেক কাছে,' এ কথাটা অন্ততঃ এক্ষেত্রে মানতে অনেক ক্ষেত্রেই বাধল। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে গল্পের কাঠামো এমন একটা পরিবেশ, সমাজের এমন একটা অংশ থেকে নেওয়া, যার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়তো দূরের কথা, বই দিয়ে পরিচয়ও আমার খুব বেশী নয়।

আজকের দিনে বেশীরভাগ সাহিত্যিকই শহরবাসী। অনেক শহুরে সাহিত্যিককেই দেখেছি নতুন প্লটের অভাবে কিংবা সহানুভূতি বশতঃ গ্রামের বা আধা শহরের পরিবেশ ও সেখানকার সমস্যা নিয়ে গল্প লেখার দিকে ঝোঁক দিতে। অনেক লেখক এভাবে দারুণ নামও করেছেন। তাঁদের গল্পে বা গল্পগুলোতে ফোটে ওঠা বাস্তবতার পরিমাণ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেন না, কারন আমরা তো ধরেই নিই যে নামী লেখকের কলম দিয়ে জল বেড়িয়ে আসে না। আমি বলছি না নামী লেখকরা কেবল বাজে গল্প লেখেন, তবে লেখকের নাম অনুযায়ী আমাদের প্রাপ্তিটা দিনকে দিন দুর্লভ হয়ে উঠেছে। কিজানি, এর কারণ হয়তোবা ব্যস্ত আধুনিক জীবন কিংবা হয়তো লেখকের চিন্তার মধ্যে লেখার তাগিদটা বাহির থেকে এতখানি আসছে যে ভেতরটার অস্তিত্ব থাকছে না বা থাকলেও প্রকাশিত হতে পারছে না। পথের পাঁচালীর বিভূতিভূষণ হয়তো আজকে অনেকের চোখে 'আধুনিক' নন তাঁর গল্পে, কিন্তু তাঁর প্রথমদিকের চার-পাঁচটা গল্পের সঙ্গে পরবর্তীকালে লেখা গল্পগুলোর তুলনা চলে কি?

সে যাকগে, উদ্দেশ্য আমার গল্প লেখা। আমার চেনা-জানা পরিবেশ থেকে কাহিনী এনে ভাবছি গল্প করব। আচ্ছা একেবারে নির্ভেজাল ঘটনা দিয়ে কি গল্প হয়? যদি হয়, তবে নিশ্চয়ই তা বাস্তবের সবচেয়ে কাছে বলে মেনে নিতে কারোর দ্বিধা থাকবে না। আমার সেই পুরানো সহপাঠিকে নিয়ে গল্প লেখা যায় কি?

আমার বন্ধুর নাম ছিল শ্যামল। বাড়ী আমাদের গ্রামেই। আমাদের গ্রামের সংবধন নীলমনি যে প্রাইমারী স্কুলটা আছে, তার সামনেই আছে একটুকরো খেলার মাঠ আর তারপরেই আছে একটা বড়ো পুকুর। গ্রামে ঐ পুকুরের নাম 'শিবের পুকুর'; কারন পুকুরের পাড়ে আছে শিব ও শীতলার মন্দির, আর চৈত্রমাসের শেষ সপ্তাহে গাজনের পর মাসের শেষ দিনে হয় চড়কপূজা। সেই চড়কপূজার 'চড়কগাছটা' ডোবান থাকে বাকী বছরের মতো ঐ পুকুরেই। পুকুরটার একদিকে মাঠ আর স্কুল, আর উল্টোদিকের পাড়ে মাঝিপাড়ায় ছিল শ্যামলদের 'বাড়ী'। আমরা একসঙ্গে ক্লাস সেভেন অবধি পড়েছিলাম। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষা সেবছর শ্যামল দিতে পারিনি। আমাদের ষান্মাসিক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পর একদিন মাঠে কাজ করতে গিয়ে শ্যামলের বাবা বিকেলে ফিরে আসেন নি, বজ্রাঘাতে মারা গেছিলেন, আর সেজন্য ও আমার চেয়ে এক ক্লাশ নিচে হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের গ্রামের চার-পাঁচটা সংসার ছাড়া বাকীগুলোর অবস্থা দিন আনে দিন খায় ধরনের। শ্যামলদের বাড়ীর অবস্থাও ছিল ঐরকম। বাড়ীর আয়ের উৎস বলতে ছিল একটা হাতে চালান তাঁত, আর বছরের যে সময়টায় চাষবাস হয়, সে সময়ে শ্যামলের বাবার মজুর খেটে উপার্জন। তাঁত চলত 'মহাজনের

নুড়ি' ঠিকেতে বুনে। শ্যামলের আরও তিনভাই ও তিনবোন ছিল। বাবা মারা যাওয়ার সময় শ্যামলদের বাড়ীর অবস্থা এমনই ছিল যে ওর বাবার শ্রাদ্ধের জন্য বাড়ীর 'তাঁতকলটা' বন্ধক রাখতে হয়েছিল।

শ্যামল এত সবের মাঝে একবছর নষ্ট করেও যেভাবেই হোক পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং মাধ্যমিকের জন্য মনে মনে বোধ হয় তৈরী হচ্ছিল। মধ্যেকার চার বছরের ইতিহাস কাউকে বলে বোঝানোর নয়, নিজের নিজের বোঝার।

ইতিমধ্যে আমি মাধ্যমিক পাশ করে গ্রামের বাইরে অন্য স্কুলে পড়ি, হোস্টেলে থাকি। কি কারণে জানি না, বাড়ী এসেছিলাম। তখন মাধ্যমিকের ফর্ম পূরণ করা চলছিল। বাড়ী এসে শুনলাম আগের দিন দুপুরে শ্মশানে 'কাপুরুষ' না কি যেন এক ধরনের ভূতে শ্যামলকে মেরে ফেলেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম পরীক্ষার ফী-র বাড়তি টাকাটা বেল বিক্রি করে জোগাড় করার জন্য পাড়ার শ্মশানে সকলের অব্যবহৃত একটা টকবেলের গাছ থেকে পাকা বেল পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ড মচকে ও মারা গেছে।

শ্যামলের কাহিনীটা গল্প নয়, ঘটনা। সাহিত্যিকদের কলমে রংদারহীনভাবে এই ঘটনা গল্প হয়ে উঠত কি? হয়ত হয়ে উঠত, কিন্তু আমি তো এই ঘটনা থেকে গল্প লিখতে পারলাম না। বোধহয় ঘটনা নিয়ে গল্প বানানো আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। গল্প সব সময় হয়তো শুধুমাত্র 'গল্প' হয়না। কিন্তু আমি অমনটা তৈরী করতে পারলাম না। অনেক গল্প লেখক ঘটনাহীন গল্প লেখেন। অবশ্য কোন মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মকে ঘটনা বললে বলতে হবে ঘটনা ছাড়া গল্প খুব কম হয়। ঘটনাহীন গল্পের লেখকদের হয় জোরাল বক্তব্য থাকে যা বাস্তব সমস্যার দিকে আঙুল তুলে দেখায়, অথবা থাকে বেশ খানিকটা চিন্তা, ডালপালা সমেত। যাই হোক না কেন ওগুলো সবই বাস্তব পরিবেশ নির্ভর। অতশত চিন্তা দিয়ে বাস্তব পরিবেশকে রঙচঙে করতে আমি পারি না। আমি শুধু আমাদের বাড়ীর সামনে হরিমন্দিরটার পাশেই যে বাড়ীটা আছে, আমাদের সেই প্রতিবেশীদের বাড়ীর এক গ্রীষ্ম দুপুরের এক ঘণ্টাকে গল্পে বাঁধতে চেষ্টা করি। নাম? গল্প থাকলেই গল্পের নাম থাকবে। কি নাম দেওয়া যায়?—মনে করুন গল্পের নাম 'গোপালদের একঘন্টা'।

উঠোনের সামনে গোবর দিয়ে ন্যাতা দেওয়া বাইরে ধানের বোঝাটা ফেলে দিয়ে গোপাল হাক দিল,

—এক গেলাস জল দে দিকি।

গোপালের বউ ছাগল বাঁধার মুগুরটাকে উঠোনে ডোবার পাড়ে ছাইগাদার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঘর থেকে তোবড়ানো এনামেলের গেলাসে জল এনে দিল। জল দেখেই গোপাল চটে লাল।

—বলি এ কি জল দিলি? এ্যাঁ? ঘোলাটে জলে কিযেন সব ভাসছে।

—বামুনদের পুকুরের জল। একটা পুকুর অতো লোকে ব্যবহার করে, তা ঘোলা হবে না?

—বলি কলের জলটাকি আনতে নেই? হারামজাদী খালি দিনরাত গিলছে, কল থেকে জলটাও আনতে পারে না।

—টিউকল খারাপ হয়ে গেছে।

গোপাল ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিল। তারপর দাওয়ায় বসে মাথার আধখোলা গামছাটা খুলে ঘাম মুছে মোড়া অবস্থাতেই সাড়ে তিনপাট করে গলা আর পেটের মাঝে ঘোরাতে লাগল।

—অ। তা বাচ্চাগুলা কোথা গেল? দে একটু তেল দে দিকি, বামুনদের পুকুরে ডুবটা দিয়ে আসি।

—বলি ডুব তো দিবে, খাবেটা কি শুনি?

—কেন ভাত হয়নি?

—হবেটা কি করে শুনি? চাল বাড়ন্ত, ভাত হবে কিসে?

—তা আগে বলিসনি কেন? আমি মানুষটা সকাল থেকে খেটে খেটে এলাম আর এখন বলে চাল নেই। বলি সারাদিন করিসটা কি?

—কাল সন্ধ্যায় এতো করে চাল আনতে বললাম, তা নয় রাতে তাড়ি খেয়ে ঘরে ফিরে এসে এখন মেজাজ দেখানো হচ্ছে!

—তাতে তোর কিরে?

—তো তাই এখন খাওনা কেন। বাচ্চাগুলা রাতের বাকী পান্তাগুলা আধপেটা করে খেয়েছে সকালে। এক্ষুণি আবার খেতে আসবে। বন্ধক দিয়ে দিয়ে ঘরে একটুকুন পিতলের জিনিষ নেই। বউ ছেলে পুলে খেতে পায় না, তায় মুনিষ খাটার টাকা পেয়েই তাড়ি দোকানে? বলি তোমার নেশার মুখে আগুন জুটে না?

—কি বলিল? মুখ সামলে বলছি—

উঁ, কি মুরোদ তা জানা আছে। খাবানোর ক্ষেমতা নেই একপাল বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। বলি লজ্জা করেনা বউ-ছেলেকে উপাসে রেখে তাড়ি গিলতে ?

—তুই আমার লজ্জা-সরম তুলিস ! তবেরে শালি ...... আজ তোকে এই বেলা কাঠ দিয়ে সায়েস্তা করব।

নিত্যপ্রথামত ঘা কতক দিয়ে গোপাল স্নানের জন্য গেলও গোপালের বউ ফোঁপাতে ফোঁপাতে ভাঙা ধনুচি হাতে চাল ধার করার জন্য পড়শীর ঘরের দিকে এগোতে লাগল।

খানিক পরে গোপাল এসে ছাগল নেড়ি ছড়ানো স্যাঁতসেঁতে উঠোনে বসে বিড়ি ফুঁকতে লাগল। ছোট মেয়েটা এসে গোপালকে খেতে ডাকল। বড় মেয়েটা চাটাটা পেতে দিল। গোপাল পায়ের উপর পা তুলে বসে গেল।

বৌ ভাতের থালা আর কলমি শাকের চচ্চড়ি বাটি ভরে এনে সামনে রাখতে গোপাল মুখ খুলল,

—এজন্যই তোকে ভালো লাগেরে। কেমন খুঁজেপেতে সব জোগাড় করেছিস। রাগ করলি নাকিরে, অ বৌ ? এমন খিদার বেলা খেতে না পেলে কারনা রাগ ধরে ? আচ্ছা তুই বল আগে কি আমাদের এমন অবস্থা ছিল ? যাহোক আগে বিঘা তিনেক ভাগে চাষ করতাম, তাতে বলে যেত। এখন আর কেউ ভাগে দিতে চায় না। রেকর্ডের ঐ ককাঠা জমি সম্বল। তা তুই ভাবিসনি, ধান তো উঠল, এবার আর খাবার কষ্ট থাকবে না।

—কেন তোমার সারের দেনাটা এবছর না শুধলে সুদ আরো বেড়ে যাবে যে। ধান বেচে আগে ওটাকাটা শুধতে হবে।

—ওসব নিয়ে ভাবিস না। ও ঠিক হয়ে যাবে। তা বাচ্চাগুলোকে খেতে দে।

গোপালের বউ বাচ্চাগুলোকে খেতে দিল। গোপাল খেয়ে দেয়ে উঠে নিজের আর বাচ্চাদের হাত মুখ ধুয়ে দিয়ে বিড়ি মুখে দিয়ে স্যাঁতসেতে দাওয়াটাকে মাদুরের ঠেলা আর হাওয়ায় খানিকটা পরিস্কার করে ছেঁড়া মাদুটার উপর শুয়ে পড়ল। গোপালের বউ হাঁড়ির হাধপোড়া মুঠোদুই ভাতকে ঢাকনা সমেত তুলে জল ডেলে চটকে নুন দিয়ে মেখে আধপচা একটা পেঁয়াজের খোশা দাঁত দিয়ে ছাড়াতে লাগল।

—



রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিকতা

শিবব্রত পট্টনায়েক
দ্বিতীয় বর্ষ
পশুচিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান বিভাগ

রবীন্দ্রনাথ কবি এবং বিশ্বকবি। সাহিত্যের অন্যান্য পর্বগুলির মতো কবিতাও রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ হাতে এক অপরূপ রূপে চিরাচরিত প্রাচীন পথ ছেড়ে নূতন পথে প্রবাহিত হয়েছে। যদিও বাংলা কাব্যে প্রথম নূতন পথের সন্ধানকারী মধুসূদন চিরাচরিত রীতির জাল ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন এবং পাশ্চাত্য ভাব, কল্পনা, জ্ঞান ও চিন্তার পথে বাঙালীর রুচি, রসবোধ, চিন্তা ও জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন। মধুসূদনের এই পথ নূতন হলেও তা ছিল বাস্তব-নিরপেক্ষ ও জাতীয় পরিবেশ হীন, প্রধানতঃ পৌরাণিক কাহিনীর পাশ্চাত্য রুচির আলোকে মূল্যায়িত, কিন্তু একই চিন্তার পরবর্তী পথিক রবীন্দ্রনাথ দেশ, কাল ও জাতির সমস্ত রকম সংস্কার ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এমন সব ভাবকে অবলম্বন করে এগিয়ে গিয়েছেন যা সর্বজনীন, সর্বকালীন ও একান্তভাবে নিজস্ব অনুভূতি ও কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত।

রবীন্দ্রনাথের এই যে নূতন চিন্তাধারার ফসল, তাকে কতখানি আধুনিক বলা যায়, তা বিচার করতে যাবার আগে 'আধুনিকতা' বলতে কি বোঝায় তা বোঝা যাক। আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী চিরাচরিত পথ, যার ভাঙাচোরা ইঁট পাথরের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই, তার ওপর দিয়ে সেই একই পুরানো গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে ছোটা ত্যাগ করে যুগপোযোগী নূতন গন্তব্য ঠিক করে নূতন চিন্তা দিয়ে নূতন এক পথ গড়ে তোলা ও তাতে এগিয়ে যাওয়ার নামই আধুনিকতা। কিন্তু প্রশ্ন হল কাব্যজগতে কোন পথই স্বয়ম্ভু হতে পারে না, কারণ জাতীয় জীবনের গঠন, চাহিদা ও কাব্যরীতির ক্রম বিবর্তন অনুযায়ী হয় কাব্যসৃষ্টি। আর 'আধুনিকতা' কথাটিই সম্পূর্ণভাবে আপেক্ষিক, কারণ আজকের মানসিকতায় যা 'আধুনিক' তা পরের শতাব্দীতেও 'আধুনিক' থাকবে কি? বোধ হয় আধুনিকতার ব্যাপারে কোন চরম সংজ্ঞা নেই।

কবি রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী কবিদের কাব্য থেকে তো নয়ই, মধুসূদনের কাব্যরীতি থেকে অনুসরণের কোন প্রেরণা পান নি। অনেক সমালোচকের মতে আধুনিক জীবনের বিবর্ণতা ও বিক্ষোভ রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী ও আধ্যাত্মপন্থী চিন্তাধারার মধ্যে ঢেউ তুলতে অক্ষম হয়েছে। এই অভিযোগ যেমন পুরোপুরি সত্য নয়, তেমনি কোন কবি কোন বিশেষ চিন্তাধারা দ্বারা চালিত হলেন না কেন, এই প্রশ্ন কোন কবির কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অবান্তর।

আধুনিক সাহিত্যের এক বড় বৈশিষ্ট্য হল রিয়্যালিজম্ অর্থাৎ বাস্তবতার চর্চা। কোন কোন সমালোচকের মতে রবীন্দ্রকাব্য বড়ো বেশী রোমান্টিক। অলৌকিক ভাবলোক হল কবির বিচরণভূমি, যেখানে তিনি খুঁজে বেড়ান প্রকৃতি ও মানব জীবনের অসীম রহস্য। বাস্তবিক, রোমান্টিক চিন্তাধারা আধুনিকতা বিরোধী তো নয়ই, বরং রবীন্দ্রকাব্যের এই রোমান্টিক চিন্তাধারা পূর্ববর্তী স্থির, স্পষ্ট, সংযত ও বুদ্ধির দ্বারা অনুরঞ্জিত সাহিত্যের জগতে এনেছিল এমন এক নবসৃষ্টির প্লাবন, যা পূর্ণ ছিল সমুন্নত কল্পনা বিলাসে। গদ্যময় দৃষ্টিভঙ্গীর উপরে অবাধ কল্পনার রশ্মি নিক্ষেপ রিয়্যালিজমের অপরিবর্তীত প্রকাশ না হতে পারে, কিন্তু তা পুরোপুরি বাস্তবত্যাগী নয়। রিয়ালিষ্ট সাহিত্যিকের মতে মানুষের জীবনে কল্পনা প্রয়োজন হীন, প্রয়োজন শুধুই বাস্তব সম্বন্ধে সচেতনতার, আর গণচেতনা জাগিয়ে সামাজিক পরিবর্তন আনা সাহিত্যিকের অন্যতম কাজ। কিন্তু রোমান্টিক কবি বাস্তবকে পরিশুদ্ধ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তার মধ্য থেকে নবরূপ ও নবরস বের করে আনেন। কাজেই রোমান্টিক কবি আধুনিকতা বিরোধী হবেন কেন?

বর্তমান কাব্যসাহিত্যে 'লিরিক' বা গীতিধর্মীতা অনেক

অংশে অনুপস্থিত। কিন্তু অনেক সুপ্রতিষ্ঠ সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীশ্রেষ্ঠ লিরিক কবি। তার বেশীরভাগ কবিতায় সবসময় এক অপূর্ব গীতি প্রবণতা উপস্থিত থাকে। যদিও অনেক সময় সঙ্গীতের প্রাধান্য থাকায় কবিতায় ভাবের বিকাশ যেন কিছুটা অস্পষ্ট কবি মানস নিয়ন্ত্রিত ভাবের প্রকাশভঙ্গীই ভাবের বিকাশে বাধা দিয়েছে, কবির প্রায় সমস্ত অতীন্দ্রিয় কবিতাই গীতি কবিতা। অবশ্য অনেকের মতে সেগুলির কিছু কিছু পদ্যে গাথা শুকনো তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ অনুভূতির জগতে সেগুলো নাকি মানুষের রসবোধের খুব কাছাকাছি যেতে পারেনি। কিন্তু শুধুমাত্র বোঝার অস্পষ্টতার জন্য যদি কবিতাগুলোকে দুর্বোধ্য বলা হয়, তবে ইঙ্গিতপূর্ণ বর্তমান যুগের কবিতাগুলো কি সাধারণ মানুষের কাছে খুবই সুবোধ্য? আসলে একথা ভুললে চলবে না যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার স্বরূপ ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বর্ণনা করে শুধু প্রকৃতির রূপ, আধ্যাত্ম চিন্তা ও প্রেম, মানুষের কথা রবীন্দ্রকাব্যে নেই। কিন্তু এই ধারণা প্রকৃত অর্থে ঠিক নয়। মানুষকে কবি এক অখণ্ড সত্যের অংশরূপে দেখেছেন, অখণ্ড সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ যার মধ্যে প্রকাশিত। দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্কীর্ণতার উপরে যে সত্তাবোধ, কবি তার উদার ও উন্মুক্ত দৃষ্টিতে দেখেছেন সেই সত্যকে। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূলকথা—খণ্ডের মধ্য দিয়ে অখণ্ড ও অনন্তের প্রকাশ—এই দর্শনই সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। সেই চিন্তার জগতে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই, ধনী দরিদ্র, শাসক-শাসিত, উচ্চ নীচ-এর কোন সমস্যা নাই। মানুষ প্রকৃতপক্ষে তার মানবিক গুণগুলো নিয়ে রবীন্দ্রকাব্যে হাজির হয়েছে। স্নেহ-প্রেম দয়া-ভক্তির মধ্যে উপস্থিত যে মাধুর্য, তাই রবীন্দ্র কবিতায় পরিণত হয়েছে রসের আধারে। তিনি আমৃত্যু মানুষকে আসার আহ্বান জানিয়েছেন এক মুক্ত, চিরন্তন জ্ঞান ও প্রেমের ক্ষেত্রে জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ লাভের জন্য।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বেশীরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে প্রেম। রবীন্দ্রকাব্যেও প্রেম উপস্থিত, তবে তার স্বরূপ আলাদা। মানুষের ক্ষণিক জীবনের প্রেমকে তিনি অনুভব করেছেন চিরন্তন প্রেমের পটভূমিকায়। দেহ ও হৃদয়কে অবলম্বন করে প্রেমের যে প্রকাশ, তার খুব সুন্দর ছবি তাঁর কাব্যে আছে ঠিকই, কিন্তু শুধুমাত্র পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আবদ্ধ প্রেমই প্রেমের শেষ পরিণতি বলে তিনি মনে করেন নি, আর তাঁর মতে তা হল চিরন্তন প্রেমের অংশবিশেষ। তাই আজকের দিনে আমরা যেগুলোকে প্রেম কবিতা বলি, তাতে দেহ ও হৃদয়ের চরম আবেগ ও আকুলতা একটা গভীর তন্ময়-তার মধ্যে রূপ ধারণ করে, সেই ধরণের কবিতা রবীন্দ্রকাব্যে নেই বললেই হয়। তবে রবীন্দ্রকাব্যের সূচনাপর্বের 'রুদ্রচণ্ড,' 'বাল্মীকি প্রতিভা,' 'কালমৃগয়া' ইত্যাদি গীতিনাট্যের ও কবিতার অধিকাংশই শেষ পর্য্যন্ত পরিণত হয়েছে ব্যর্থ প্রেমে, যার নায়ক হলেন একজন কবি। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি এই মানসিকতা ত্যাগ করেছিলেন। তার মানসিকতার পরিবর্তন 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় সহজেই পাই, যেখানে কবি অন্নহীন, শিক্ষাহীন, জাতির দুঃখ দুর্দশায় ব্যথা পেয়েছেন, কিন্তু তার প্রতিকারের পথ খুঁজেছেন ব্রহ্মবোধের মধ্যে, মহামানব সুলভ উপলব্ধি দ্বারা সমস্ত সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি কাটিয়ে মানবতাবোধের সত্যভূমিতে। প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে তাঁর ধারণা তাঁরই নিজের কথায়, 'জীবের মধ্যে অনন্তকে উপলব্ধি করাই ভালোবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নামই সৌন্দর্য্য'।

আধ্যাত্মিকতা রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্তমান বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামানো হয় না। কিন্তু একথা ভাবা ভুল যে কবিতায় আধ্যাত্মচিন্তা আধুনিকতা বিরোধী এই ধরণের মানসিকতার জন্ম পাশ্চাত্য সাহিত্যচিন্তাই একমাত্র সঠিক পথের নিশানা দিতে পারে, এরূপ ধারণা থেকেই, জীবনের চরম উৎকর্ষ সম্পর্কে যেমন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণার পার্থক্য আছে, তেমনই কাব্যে তার প্রতিফলন স্বাভাবিকতারই নিদর্শন। রবীন্দ্রকাব্যে ঈশ্বর সম্পর্কে কবির অনুভূতি ফুটে উঠেছে 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতিমাল্য,' 'গীতালি' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে, ভারতীয় সাধনার মূলকথা ব্রহ্মকে সম্মুখে রেখে জগৎ ও

জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ করা। ভোগের জন্যই ভোগ নয়, ত্যাগ ও ব্রহ্মানুভূতি দ্বারা পরিশুদ্ধ ভোগই গ্রহণীয়, এই ধারণা ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রকাব্যের অনেক অংশে। আজকের দিনে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে নারী। কামনা ও নারী চিন্তার রাজ্যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এখানে। রবীন্দ্রকাব্যে দেখা যায় তরুণ যৌবনে কবি অনুভব করেছেন তার যৌবন স্বপ্নে সারা বিশ্ব রঙীন। নারীর দেহ-সৌন্দর্য তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, আর তিনি তা এঁকেছেনও নিপুণভাবে তার কাব্যে, ভোগ ও লালসা কবিতাগুলিতে প্রবলভাবে ফুটে উঠলেও শেষে তার মধ্যেই এক দেহাতীত অপার্থিব সৌন্দর্যের বিকাশ দেখা যায়, তাঁর কবিতায় রমণীর স্তন 'জননীলক্ষ্মীর কমলাসনে' পরিণত হয়েছে। বিবসনা নারীর দেহে তিনি দেখেছেন 'লাজহীন পবিত্রতা' নারীর সাথে পূর্ণমিলন আকাঙ্ক্ষা করে বুঝেছেন 'ঈশ্বর ছাড়া' এ 'মিলন' কোথাও সম্ভব নয়, এখানেই ফুটে উঠেছে বাস্তব জগতের মধ্যে তাঁর আধ্যাত্মচিন্তা, যা কবিকে বিশিষ্টতা দান করেছে বস্তুতঃ একান্ত দেহগত ভোগে তিনি আবদ্ধ থাকতে পারেন নি, তাই নারীর দেহ সৌন্দর্য এক অপার্থিব সৌন্দর্যে পরিণত হয়েছে, আর যৌন আকর্ষণ পরিণত হয়েছে এক ভাবগত আকর্ষণে। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে এই চিন্তার বিকাশ ভালোভাবেই দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ কি যুগ সাহিত্যিক ? —এ প্রশ্নের উত্তরে সবাই একমত নন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রযুগের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রবীন্দ্রসাহিত্যে অনেকাংশে প্রকাশিত, তবু কবি নিজ দুর্বলতা স্বীকার করে 'যে আছে মাটির কাছাকাছি' তার জন্য 'কান পেতে' ছিলেন, বিভিন্ন শতাব্দীর বা একই শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হয়, কাজেই বাস্তবতা সম্পর্কে বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হয়। সেজন্য একথা বললে আদৌ অত্যুক্তি হয় না যে রবীন্দ্রনাথই প্রকৃত অর্থে বাংলা কাব্যজগতে আধুনিক ভাবগঙ্গার ভগীরথ। প্রখ্যাত এক রবীন্দ্রকাব্য সমালোচকের মতে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে বাংলার কবিরা শুধু চেষ্টা করার চেষ্টা করেছেন কাব্যজগতে রবীন্দ্র প্রভাবের জাল ছিঁড়ে বের হওয়ার, আর এরই ফলশ্রুতি হল রবীন্দ্রকাব্য থেকে কিছুটা আলাদা ধ্যান-ধারণার বর্তমান যুগের কাব্যপ্রবাহের ধারার সৃষ্টি।

যে বইগুলো থেকে এই প্রবন্ধ লেখার জন্য সাহায্য নিয়েছি, সেগুলো হল—

১। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ

২। রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্তী

৩। বাংলা কাব্য সাহিত্যের কথা—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—চিত্তরঞ্জন মাইতি

৬। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।